রাতুল পাল
জন্ম : ১৯৮৮, ফকিরহাট, বাগেরহাট।
মাতা ও পিতা :
বীণাপাণি পাল
উপেন্দ্রনাথ পাল।
অধ্যয়ন : ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, শেষ বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক, শাশ্বতিকী (সাহিত্য ও সংস্কৃতির পত্রিকা)।
প্রিয় বই : পুতুল নাচের ইতিকথা, কবি, লালসালু, রক্তকরবী, **Animal F***arm*, *The Outsider, Macbeth, The Mother Courage,* **The Catcher in the Rye.** *The Death of Ivan Ilych, , The Metamorphosis.*
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, সৈয়দওয়ালীউল্লাহ, আবদুশ শাকুর, মপাসাঁ, অস্কার ওয়াইল্ড ও গ্রিম ব্রাদার্স এর ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, কীটস, ইয়েটস, কালিদাস ও কাহলিল জিব্রান এর কবিতা...

puzzled.philo@gmail.com

Dwi Dha
by Mojafor Hossain Ratul Pal
Cover design : Charu Pintu
Price Bdt : 135.00 Only US$: 5.00
Printed in Bangladesh
www.anneshaprokashon.com

an Annesha Prokashon
Publication

দ্বিধা । মোজাফ্‌ফর হোসেন রাতুল পাল

দ্বিধা

মোজাফ্‌ফর হোসেন
রাতুল পাল

মোজাফ্‌ফর হোসেন
জন্ম : ১৯৮৬, শালিকা, মেহেরপুর।
মাতা ও পিতা :
মোছাঃ মনোয়ারা বেগম
মোঃ আওলাদ হোসেন।
অধ্যয়ন : ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, শেষ বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক, শাশ্বতিকী (সাহিত্য ও সংস্কৃতির পত্রিকা)।
প্রিয় বই : *কবি, পুতুল নাচের ইতিকথা, আরণ্যক, গোরা, ভোলগা থেকে গঙ্গা, লালসালু, মা, শেষের কবিতা, কথোপকথন, চাপরাশ, সেদিন যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, নূরলদীনের সারাজীবন, নারী, হিউম্যানিজম,* Faust, The Death of Ivan Ilych, The Heart of Darkness, Gulliver's Travels, Great Expectation, Anna Karenina, Tess of D'U, Les Misérables, Uncle Tom's Cabin, The Outsider, Dr. Jekyl and Mr. Hyde, The Metamorphosis, Animal Farm, Oedipus, Lysistrata, Mother Courage, A Doll's House, Dr. Faustus Macbeth, Classic Myths, The Brothers Karamazov, The-Encyclopedia-of-World-Religions, When God was a Woman

mjafor@gmail.com

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

দ্বি ধা

মোজাফ্ফর হোসেন
রাতুল পাল

অন্বেষা
অন্বেষা প্রকাশন

দ্বি ধা
মোজাফ্ফর হোসেন
রাতুল পাল

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
ঢাকা বইমেলা ২০১০

অন্বেষা ২২০

অন্বেষা

প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
নিয়াজত পাজা
৯ বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা ১০০০

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

Dwi dha by Mojaffor Hossain, Ratul Pal.
First Published Dhaka Book Fair 2010
Mohammed Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

www.anneshaprokashon.com
E-mail : annesha_prokashon@yahoo.com

Price : Tk. 120.00 only US $05.00
ISBN : 984 70116 0170 0 Code : 220

উ ৎ স র্গ

মা

ও

শাশ্বতিকীর প্রতিটি পাঠক

প্রসঙ্গত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শেষবর্ষে অধ্যয়নরত দুই তরুণ গল্পকার মোজাফ্ফর হোসেন এবং রাতুল পাল-এর গল্পগ্রন্থ 'দ্বি ধা' প্রকাশিত হচ্ছে ঢাকার 'অন্বেষা প্রকাশন' থেকে। ব্যাপারটি আমাকে একটি ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালের নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্যোগে 'মাওলা ব্রাদার্স' আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ক্ষীয়মাণ' যখন প্রকাশ করে ১৯৬১ সালে, তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র। চট্টগ্রাম কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সের ছাত্র থাকাকালীন লেখাগুলি গ্রন্থস্থ করতে আমি চাচ্ছিলাম না গল্পগুলির কলেজি গন্ধের 'দোষে'। বাংলা বিভাগের বন্ধু কবি সেবাব্রত চৌধুরী বলেছিল সে-গন্ধটির 'গুণে'ই গল্পগুলি গ্রন্থিত হওয়া উচিত। খুবই আলোচিত হয়েছিল বইটি এবং আজো পর্যন্ত ওটি আমার পরবর্তী সংকলনগুলির চেয়ে বেশি আদৃত। আলোচ্য সংকলনটির কয়েকটি গল্প পড়ে মনে হল এঁদের 'দ্বি ধা' গল্পগ্রন্থটিও স্মৃত হবে প্রথমত তারুণ্যের 'গুণে'ই।

এ ছাড়া একই গ্রন্থে এ দুই গল্পকারের যুগলবন্দিও সঠিক বোধ হয়েছে আমার। মোজাফ্ফর হোসেনের 'ট্রিটমেন্ট', 'জীবন যেখানে যেমন', 'মসজিদ', 'উড়ে যায় সাদা শকুন' এবং রাতুল পালের 'মহামতি দম্বল', 'ব্যথাহীন', 'জাগরণ' ও 'আবিষ্কার' পড়ে মনে হল শব্দে, শৈলীতে, মননে, সংবেদনে, গল্পকথনে এবং পরিবেশনে এ-দুই গল্পকার একে অন্যের পরিপূরক। মোজাফ্ফর হোসেনের গল্প হৃদয়নিঃসৃত হলে, রাতুল পালের গল্প মস্তিষ্কসৃজিত। একজন ভাবাকুল তো একজন চিন্তাকুল।

তবে দুজনেই রবীন্দ্রনাথের গান কান পেতে শুনেছেন : তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী/ আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি॥ কবি অবাক হয়ে শোনেন, কী গান করো নয়, কেমন করে করো। কারণ তিনি জানেন 'কী' থেকে 'কেমন' কাল জয় করে বেশি।

দুজনেই মন দিয়ে প্রমথ চৌধুরীর লেখাও পড়েছেন, যিনি লিখেছেন : 'মাসিক সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে ছোটোগল্প। এই ছোটোগল্প কী ভাবে লেখা উচিত সে বিষয়েও আজকাল আলোচনা শুরু হয়েছে। এও আর-একটি প্রমাণ যে, লেখবার বিষয়ের অভাববশতই লেখবার পদ্ধতির বিচারই আমাদের দায়ে পড়ে করতে হয়। এ সম্বন্ধে আমার দুটি কথা বলবার আছে। আমার মতে ছোটোগল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই; তার পরে ছোটো হওয়া চাই; এ ছাড়া আর-কিছুই হওয়া চাই নে।' (সবুজ পত্র, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ॥ পৌষ, ১৩৩৩)।

দুজনেই প্রখ্যাত অধ্যাপক ও কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত ছোটগল্পের গভীর প্রণিধানযোগ্য সংজ্ঞাটিকে সানুধ্যান পাঠ এবং আত্মসাৎ করেছেন বলেও মনে হল : 'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।' (সাহিত্যে ছোট গল্প / দ্বিতীয় খণ্ড, রূপতত্ত্ব, পৃ. ৫০৫, না. গ. র, দ্বাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ)।

সকল যুগেই মানুষের সর্বপ্রধান মানসিক আহার হচ্ছে গল্প। উপমহাদেশের অতীত গল্পপ্রাণ। লৌকিক অলৌকিক সকল সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে কথাসাহিত্য। 'আখ্যায়িকা' অতি পুরাতন কথাসাহিত্য এবং তা একাই জমিয়ে রেখেছে জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎ-সাগর, দশকুমার-চরিত, শুকসপ্ততি, আরব্য উপন্যাস (আলিফ লায়লা), তার নবতর সংস্করণ পারস্য উপন্যাস (হাজার আফসানে), দেকামেরন এবং উপদেশাত্মক গল্পমালার বৃহত্তম ইয়োরোপীয় সংস্করণ গেস্তা রোমানোরাম (রোমানদের কার্যকলাপ) বা সংক্ষেপে গেস্তা, ক্যান্টারবেরি টেল্‌স, গায়গাঁতুয়া, পাঁতাগুয়েল। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আখ্যায়িকা ছোট হলেও ছোটগল্প হয়ে ওঠে না, ভেজাল হিসেবে ছোটগল্পের দলে ভিড়ে গেলেও সহজেই ধরা পড়ে যায়।

'ছোটগল্প' যেন কবি-স্বভাবের দার্শনিক, আর 'আখ্যায়িকা' যেন ব্যবহারিক স্বভাবের সাংসারিক। ছোটগল্প গৃহী-সন্ন্যাসীও হতে পারে, কিন্তু আখ্যান নিতান্তই গৃহী। এই গৃহীটিকে চেনার প্রথম উপায়টি হল তার দ্ব্যর্থহীন অন্তিম যতি। ওটি এমনই পূর্ণতা-সূচক যে, এর পরে যেমন তার নিজের বলার কোনো কথা থাকে না, তেমনি পাঠকেরও মনেও কোনো কথা জন্মায় না; অর্থাৎ এ পাঠককে ভাবাতে থাকে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গল্প হলেই ছোটগল্প হল না। গল্পটির একটা

কৌতূহলোদ্দীপক আরম্ভ থাকতে পারে, থাকতে পারে একটা চমকপ্রদ অন্তর। কিন্তু গল্পের ভেতরে অন্তর্বয়ান, কিংবা বিভিন্ন তাৎপর্যের বিবিধ স্তর, অথবা মানবপ্রকৃতির প্রতি কৌণিক দৃষ্টি না-থাকলে, বা অভিনব কোনো অভিমুখ কিংবা জগজ্জীবনে মানবের স্থিতি বিষয়ে বিচিত্র কিছু আলোকপাত না-থাকলে সেটা গল্পই থেকে যাবে, ছোটগল্পের পরিভাষাটি পাবে না। এর মানে ছোটগল্পে 'ঘটনা থাকবে না' তা কিন্তু নয়। ঘটনা অবশ্যই থাকতে পারে, তবে ওটা নিছক কাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। অপর পক্ষে ঘটনা পরিহার করেও যদি একটি বিশেষ ভাব বা মুডের মধ্যেই একটি মহামুহূর্তের উদ্ভব কোনো লেখক তাঁর গল্পে ঘটাতে পারেন এবং মানবচরিত্র বা তার জীবনরহস্যের কোনো গভীরতা বা বিশালতার দিক্‌দর্শন করাতে পারেন– তবে সেটাও সার্থক ছোটগল্প হতে পারে বইকি। এমনি একটি মহৎ ছোটগল্পের উদাহরণ মার্কিন গল্পকার জেরোম ওয়াইডম্যানের 'মাই ফাদার সিট্‌স ইন দ্য ডার্ক'-নামক তাঁর শ্রেষ্ঠগল্প-গ্রন্থের নামগল্পটি। এ ধরনের গল্প হয়তো আলোচ্য গ্রন্থেও আছে। পাণ্ডুলিপি তো আমি পুরো পাইনি।

'দ্বি ধা'র গল্পকার মোজাফ্‌ফর হোসেন সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক মান-সচেতন পত্রিকা 'শাশ্বতিকী'র সম্পাদক। অপর গল্পকার রাতুল পাল পত্রিকাটির সহ-সম্পাদক। শুরুতেই এঁদের তৎপরতার ব্যাপকতা এবং গভীরতা দেখে আমার আশা জাগে যে, অন্তে এঁরা সাহিত্যের জগতে অনেক দূরগামী হবেন। *bon voyage!* শুভযাত্রা! এই কামনাই করি আমার ছাত্রদের-ছাত্রীদের প্রতি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে আমি এঁদের ক্লাসেরও শিক্ষক ছিলাম ১৯৬৭ সালে।

আবদুশ শাকুর

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা,
ঢাকা।
০১. ১২. ২০১০

গল্পের সূচি

মোজাফ্‌ফর হোসেন

জন্মদিনের উপহার / ১৫
হায়াত / ১৯
মসজিদ / ২২
একটি সভ্যতার গল্প / ২৭
জীবন যেখানে যেমন / ৩১
ট্রিটমেন্ট / ৩৭
সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ গল্প / ৪১
মৃত্যু মৃত্যু খেলা
ও একটি গল্প / ৪৬
উড়ে যায় সাদা শকুন / ৫১

রাতুল পাল

৬১ / জাগরণ
৬৪/ ব্যথাহীন
৬৯ / আবিষ্কার
৭৩ / এক শহরে একদিন আমি
৭৮ / মহামতি দম্বল
৮১/ নিরাপত্তা
৮৫ / বৃহৎ সমীপে ক্ষুদ্র
৮৭ / কবি ও নিষ্ঠুর রাজকন্যা
৯৫ / নৈঃশব্দ্য

মোজাফ্‌ফর হোসেনের গল্প

জন্মদিনের উপহার

ক.

সবদার সাহেব আজ এই সাতসকালে মেয়েকে নিয়ে বের হয়েছেন। অবসর পেলেই তিনি মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন;— রিকশায় চড়ে ঢাকা শহরের বন্ধ্যা বাতাসে গল্পের ফুলঝুরি মিশিয়ে দেন দুজনে। গল্পের বিষয়বস্তুর অভাব হয় না তাদের; কখনো মাথার উপর উড়তে থাকা বিচ্ছিন্ন কাক, কখনো রাস্তার অসহায় ছেলেটা, কখনো বা যানবাহনের এক একটি চাকা, আরো কত কী! বাপ-মেয়ের এই আলাপচারিতায় মগ্ন থাকা, মান-অভিমান নব্য প্রেমিক-প্রেমিকাদের সখ্যতাকেও হার মানায়। সেলিনা আক্তার, সবদার সাহেবের স্ত্রী, তো প্রায় বলেন, "বাপ-মেয়ের সংসারে আমার অবস্থান অনাবশ্যক হয়ে উঠেছে; কাজের মেয়েরও তো একটা কদর থাকে, পাছে চলে যায় এই ভয়ে। আমার অবস্থান যে পাকাপক্ব দুষ্টু চক্রের জানতে তা আর বাকি নেই।"

তবে আজকে, এই সাতসকালে তাদের বের হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল একেবারে ভিন্ন : সবদার সাহেব তার মেয়ে সূচিকে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেলিনা আক্তার গত বছরেই ভর্তি করাতে চেয়েছিলেন। বাপ-মেয়ে বেশ পরিকল্পনা করেই তা এক বছর পিছিয়ে নিলো। রিকশা বাঁক্ নিয়ে হাই রোডে উঠতেই ট্রাফিক পুলিশ হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলেন। সূচি তা দেখে বলল, "বাবা, তুমি ট্রাফিক হলে না কেন? তুমি ইচ্ছে মতো সব গাড়ি থামিয়ে দিতে পারতে, আবার ইচ্ছে মতো চলতে দিতে? আমার বড় বড় গাড়ি দেখলে খুব ভয় করে, তুমি ঢাকার সব বড় বড় গাড়ি থামিয়ে রাখতে।"

মেয়ের কথা শুনে সবদার সাহেব এমন ভান করলেন যেন ট্রাফিক পুলিশ না হয়ে বড় অপরাধ করে ফেলেছেন। অপরদিক থেকে ধেয়ে আসা মিছিলটি তাদের অতিক্রম করতে থাকে। সবাই শ্লোগান দিচ্ছে :

জিন্নার ঘোষণা...মানি না...মানবো না...
উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা ...মানি না...মানবো না...

প্ল্যাকার্ডে লেখা : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই — মায়ের ভাষা বাংলা চাই

সূচি বাবার কানে কানে বলল, "এরা খুব দুষ্টু মানুষ; তাই না বাবা?"

"না মা, এরা খুব ভালো মানুষ।"— সবদার সাহেব বললেন।

বাবা সায় না দেওয়াতে সূচি অভিমানের সুরে বলে, "কিন্তু মা যে বলে যারা মিছিল করে তারা খুব খারাপ মানুষ।" বাবার বলা কথাটি মার নামে চালিয়ে বেশ স্বস্তি পায় সে, তার বিশ্বাস মা খুব কমই জানে।

"তোমার মা ঠিকই বলেন,"— সবদার সাহেব বলেন, "কিন্তু এরা সবাই আমাদের ভাষার জন্য মিছিল করছে। আমি এবং তুমি যে ভাষায় কথা বলছি সেই বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে মিছিল করছে এরা।"

"আমরা তো বাংলাতেই কথা বলি বাবা! এর জন্য মিছিল করার কী আছে?" সূচির চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

"কিন্তু মামণি ওরা চায় না আমরা বাংলাতে কথা বলি।"— সবদার সাহেব বললেন।

"ওরা কারা বাবা?"

"ওরা পাকিস্তানের মানুষ। ওরা চায় আমরা সবাই ওদের উর্দু ভাষাতেই কথা বলি?"

"ওরা খুব দুষ্টু তাই না বাবা! পাকিস্তান কোথায় বাবা? "

"অনেক দূরে মা।"

"নীল ভাইদের সাত তলার উপরে উঠিয়ে আমাকে একদিন দেখাবে?" সূচি যেন বায়না ধরে বসে।

"ওখান থেকেও দেখা যায় না মামণি। সাতসাগর-তেরনদী পার হয়ে ওখানে যেতে হয়। ওদের ওখানকার সূর্যও আমাদের এখান থেকে দেখা যায় না!"

"ওরা এতো দূরে থাকে, তো আমরা ওদের ভাষায় কথা বলবো কেনো?" সূচির প্রশ্ন যেন শেষ হতে চায় না।

"বলবো না মামণি, এজন্যই তো সকলে মিছিল করছে।"

"আচ্ছা বাবা, সবাইকে কি তাদের ভাষার জন্য এমন মিছিল করতে হয়?"

"না মা, কাউকেই করতে হয় না, পৃথিবীর সবাই যে যার ভাষাতেই কথা বলে, এজন্য কাউকে মিছিল করতে হয় না। "

"তাহলে আমরা মিছিল করবো কেনো?"

"মিছিল, প্রতিবাদ না করলে যে ওরা আমাদের ভাষা কেড়ে নিয়ে উর্দু ভাষাতে কথা বলাতে বাধ্য করবে। ওরা যে অনেক শক্তিশালী মা!"

বাবার কথায় অনেকক্ষণ নীরব থাকে সূচি তারপর হঠাৎ করে বলে ওঠে, "আচ্ছা বাবা, বনের রাজা সিংহ তো সবচেয়ে শক্তিশালী। তাহলে কি সিংহ বনের সব পশুকেই তার ভাষাতেই কথা বলায়?"

সবদার সাহেব মেয়ের প্রশ্ন শুনে একটু নড়েচড়ে বসেন। তিনি বলেন, "না মা, সব পশু পাখিরাই তাদের নিজ ভাষাতেই কথা বলে; আমরাও বলব। কেউ

আমাদের ভাষাকে কেড়ে নিতে পারবে না।" মেয়ের সাথে সাথে নিজেকেও আশ্বস্ত করেন তিনি। সূচি আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। ইতোমধ্যে রিকশা বাড়ির কাছে পৌঁছে যায়। বাপ-মেয়ে পরস্পরের হাত ধরে বাড়িতে প্রবেশ করে।

খ.

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে সবদার সাহেব বের হয়েছেন। ঢাকার অবস্থা ভালো না। দফায় দফায় মিছিল হচ্ছে। মিছিলে লাঠিচার্জ করা হচ্ছে নৃশংসভাবে। তবু বাঙালিরা দমবার পাত্র না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না কেউই। সেলিনা আক্তার 'রবীন্দ্র রচনাবলী' হাতে করে বসে আছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তিনি কাজকর্ম সেরে বই পড়তে বসেন। এটা তার অনেক পুরোনো অভ্যাস। নজরুল, শরৎ, বিভূতিভূষণ, মানিক, রোকেয়া..., যখন হাতের কাছে যাঁর বই পান তাঁর বই নিয়েই বসে পড়েন। কদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন তিনি। আজ কিছুতেই মন বসছে না পড়াতে। দূরের পোস্টারে লেখা— 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', লেখাটি যেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি পাতার সাথে সেঁটে গেছে।

বেশ রাত করেই আজ সবদার সাহেব বাড়ি ফেরেন। হাতমুখ ধুয়ে তিনি স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে খেতে বসেন। সূচি অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ডেকে ওঠে, "ভোলা আর ভুলু খেতে এসো।" অমনি বাড়ির পোষা কুকুর আর বিড়ালটি খাবার টেবিলের পাশে এসে বসে পড়ে। সেলিনা আক্তার পৃথক পৃথক পাত্রে ওদেরকেও খেতে দেন। খাবারের মাঝখানে সূচি বলে উঠে, "আচ্ছা বাবা, ওরা যদি আমাদের ভাষাকে কেড়ে নেয় তাহলে ভোলা-ভুলু কী করবে? ওরা তো বাংলা ছাড়া বোঝেই না!" সবদার সাহেব কিছু বলতে যান। সেলিনা আক্তার ধমকের সুরে বলে ওঠে, "খাওয়ার সময় একদম কথা বলবে না। বাবাও হয়েছে তেমনি। সংসারে মন নেই। সারাদিন মেয়ের সাথে বকর বকর। কাল যে ২১-শে ফেব্রুয়ারি, মনে আছে?" "ওহো ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল আমার সূচি মামণির জন্মদিন"— বলেই সবদার সাহেব এঁটো হাত দিয়ে সেলিনা আক্তারের গাল টিপে দেয়। সেলিনা আক্তার ভালোলাগা ও বিরক্তির মিশ্র প্রতিক্রিয়া করে বলেন, "জন্মদিন আমার, না তোমার মেয়ের!" সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই খাবার টেবিলের নিয়ম ভঙ্গ করে উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

খাওয়া দাওয়া সেরে সবদার সাহেব প্রতিদিনকার মতো কলেজের খাতা ও টুকটাক কাজ নিয়ে বসে পড়েন। কিন্তু কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারেন না তিনি। কাল তার মেয়ের জন্মদিন। জন্মদিনের সর্বোত্তম উপহার কী হতে পারে সেই ভাবনায় মন অস্থির হয়ে ওঠে তার। মা-মেয়ে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়বার কথা। সবদার সাহেব সবকিছু গোছগাছ করে ঘুমাতে যান, যা তিনি কোনোদিনই করেন না এবং খুব ভোরে সেলিনা আক্তারের এই কারণে বকাবকিতে তার ঘুম ভাঙ্গে। সবদার সাহেব মা-মেয়ের পাশে আস্তে করে শুয়ে পড়েন। ১২ টা বাজতে

তখনও ১০ মিনিট বাকি। সূচি বাবার হাতে মাথা উঠিয়ে দেয়। মেয়েটি যে এখনো ঘুমায়নি বুঝতে পারেন সবদার সাহেব।

"এখনো ঘুমাওনি কেন মামণি?" মেয়েকে আরও কাছে টেনে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

"ঘুম আসছে না। আচ্ছা বাবা, ওরা কি আর আমাকে বাবা ডাকতে দেবে না? তুমি কি আমাকে আর মা বলে ডাকবে না?"

সবদার সাহেবের চোখে জল চলে আসে। সূচি যেদিন জন্মেছিল সে দিন তার চোখে জল এসেছিল, আজ দীর্ঘ ৭ বছর পর তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ঘড়ির কাঁটা ঢং ঢং করে জানান দিল তার পূর্ণতার কথা। সবদার সাহেব মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "না মামণি, ওরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আমি তোমাকে মা বলেই ডাকবো।" মাথা তুলে দেখলেন সেলিনা আক্তারের চোখেও পানি ছল ছল করছে। তিনি সেলিনা আক্তারের মাথায় আলতো করে চুমু খেয়ে বললেন, "আর তোমাকে আমি আমার ভাঙ্গা ঘরের রাজরানী বলেই ডাকবো।"

গ.

পরদিন, ২১-শে ফেব্রুয়ারি। সবদার সাহেব সকালের নাস্তা সেরে মেয়ের জন্য উপহার কেনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন; আজ আর মেয়েকে সঙ্গে নিলেন না; উপহারটা সম্পূর্ণ সারপ্রাইজ রাখবেন তিনি। মা-মেয়ে জন্মদিনের কেক নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। সূচি প্রতিবার রিক্‌শার শব্দ শুনে ছুটে যায় জানালায়— বাবা এলো বুঝি; কিন্তু প্রতিবারের মত সেবারও হতাশ হয়ে ফিরে এসে মাকে বলে, "মা, বাবা তো এখনো আসে না!" এভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়। এতক্ষণে সেলিনা আক্তারের মনে হাজার রকমের দুশ্চিন্তা এসে আবাস গড়ে। এদিকে ঢাকার অবস্থাও ভালো না। ১১-দফা ভঙ্গ করে দেশবাসী 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেছে। বিকেল ৪টার সময় খবর আসে, মিছিলে গুলি করা হয়েছে— সফিক, রফিক, সালাম, বরকতসহ মারা পড়েছেন আরো অনেকে। সেলিনা আক্তার সূচিকে নিয়ে ছুটে যান সেখানে; লাশ ততক্ষণে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি সংশয় ও সুপ্ত আশার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসেন। সেদিন আর সবদার সাহেব ফিরে আসেন না। সেলিনা আক্তার ও সূচি অপেক্ষা করতে থাকে...। অপেক্ষা করতে থাকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেলিনা আক্তার তার স্বামীর অপেক্ষায় ছিলেন। সূচির ভালো লাগে ভেবে, জন্মদিনে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান উপহারটি তাকে তার বাবা দিয়ে গিয়েছেন— তা হল 'বাংলা'। 'বাংলা' নিয়েই বেঁচে থাকে সূচি; বাবার স্পর্শ, মমতা সব কিছুই বাংলার মাঝে খুঁজে পায় সে।

প্রকাশ : ধমনি, প্রাঙ্গণ, ভারত বিচিত্রা

হায়াত

বাড়িতে মানুষের হাট বসেছে যেন, তবুও লাশটিকে ধরে বিলাপ করার মতো একটা মানুষও খুঁজে পাওয়া গেল না। মজিদ এ বাড়ির গৃহস্থালির কাজ-কর্ম দেখাশুনা করে, এখন সে কবর খোড়ায় ব্যস্ত। হাফেজ মিয়ার পারিবারিক গোরস্থানের এক কোণায় করবটি খোঁড়া হচ্ছে। রাজা লাশটিকে চাটাই দিয়ে ঢেকে রেখে বাঁশ কাটার ব্যবস্থা করছে। রাজা এ বাড়ির গরুর রাখাল। মা বড় সাধ করে নাম রেখেছিল রাজা। কোনো দেশে একবার এক ফকিরের ছেলে নাকি রাজা হয়েছিল। বলা তো যায় না! তাই রাজার মা আগে ভাগেই ছেলের জন্য এই যুৎসই নামখানা রেখে দিয়েছিল। রাজা এখন মিয়া বাড়ির গরুর রাখাল। এ বাড়ির রাখাল হওয়ার স্বপ্ন আশেপাশের দশ গ্রামের রাখালরা আয়েশ করে দেখে। রাজা এখন রাখাল সমাজের রাজাই বটে। "ঝামেলা জুটার আর জায়গা পালু না। হ্যালায় মজিদের পুলা, মরা ভেসে যাচ্ছিলু যাক, তুলে আনার দরকার কী আছিল! আজ এ বাড়ির এত বড় একখান আনন্দের দিন, আর হ্যালায় কুত্ থেকি একটা মরা কুড়ি আনছে।"— রাজা আপন মনে বকে চলেছে।

খ.

মিয়াবাড়ির বড়ছেলে হায়াত মিয়া আজ বিশ বছর পর বিলেত থেকে বাড়ি ফিরছে। বাড়িতে তাই বিশাল আয়োজন— গত বছর সেজো ছেলের বিয়েতেও এত বড় আয়োজন হয়নি। হাফেজ মিয়ার সাত ছেলে এবং ছয় মেয়ে। স্ত্রী তিনটা, তিনটাই জীবিত। তবে স্ত্রীদের মধ্যে তথাকথিত সতীনের সম্পর্ক নেই। তারও অবশ্য কারণ আছে— এরা সবাই খুবই গরিব ঘরের মেয়ে, আয়েশ করে দু'মুঠো ভাত খেতে পাচ্ছে, এই এদের জন্য উপচে পড়া। আবার স্বামীকে নিয়ে টানাটানি করার মতন বয়স গত হয়েছে অনেক আগেই। হায়াত মিয়া মেঝ বৌয়ের ছেলে। বড় সন্তান অবশ্য বড় বৌয়ের কোলেই এসেছিল— সেটি ছিল কন্যা সন্তান। প্রথম ছেলেসন্তান পেটে ধরার দেমাগ মেঝো বৌয়ের ভেতরে অনেকদিন রয়ে গিয়েছিল। বাড়ির বড় সন্তান হায়াত মিয়াকে হাফেজ মিয়া বড় স্বপ্ন নিয়ে বিদেশ

পাঠায় ডাক্তারি পড়ার জন্য। সেই থেকে হাফেজ মিয়া গ্রামের কারো অসুস্থতার খবর পেলে আগ বাড়িয়ে গিয়ে বলেন, "ধৈর্য্য ধরো হে, আমার ছেলে দেশে ফিরলি তুমার এই ব্যারাম বাপ বাপ করি পালাবে।" কারো ইহত্যাগের খবর শুনলে বলেন, "আহা রে বেচারি! আর কটা দিন জানটাকে ধরি রাখতি পারলু না; — আমার হায়াত আসলি আযরাইলের ক্ষেমতাই হতু না...!" ছেলে বিদেশ গেলে অসুস্থ মাকে গঞ্জের ডাক্তারের কাছে নেওয়া বন্ধ করে দিল হাফেজ মিয়া। হায়াতের দাদি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে সবাই যখন খুব পিড়াপিড়ি করল ডাক্তারের কাছে নেওয়ার জন্য, হাফেজ মিয়া বললেন, "গঞ্জের ডাক্তার কী জানে শুনি? ঢাকা থেকি দু'কলম বিদ্যে নিলিই ডাক্তার হওয়া যায়? ডাক্তার হওন কি এতই সস্তা!" বুড়ি মারা গেলেন বিলাপ বকতে বকতে, "আমার হায়াতকে খবর দে...! হায়াত! আমার হায়াত রে!"

বছর যেতে না যেতেই ছেলের জন্য মেয়ে দেখা শুরু করলেন হাফেজ মিয়া। আশেপাশের দশ গাঁয়ের কোনো মেয়েকেই তার মনে ধরল না। যদি বা একটা একটু পছন্দ হয়— "আমার ছেলে বিলেত ফেরত ডাক্তার! এ বাড়ির পরিবেশটা তার জন্যি একেবারেই মানাবি না।" ছেলে হায়াত মিয়া সাদা চামড়ার এক মেয়েকে বিয়ে করে বিদেশেই রয়ে গেল। হাফেজ মিয়া এই দুঃখে জনসম্মুখে আসাই প্রায় বন্ধ করে দিল। মেঝ বৌয়ের দেমাগি ভাব কোথায় যেন উবে গেল। আশেপাশের মানুষেরা টিটকিরি মেরে বিলেতি গাই বাড়ি আনার কথা বললে হাফেজ মিয়া চটে গিয়ে বলেন, "ওদের মরা মুখও আমি দেখতে চাই না"। ছোট বৌ তার ছেলেকে বিদেশ পাঠানোর বায়না ধরলে চটি হাতে তেড়ে আসেন হাফেজ মিয়া— "শালী, ছেলে হারানোর আল্লাদ জুড়ছে! আমার নাক কি এতই লম্বা ?"

ইতোমধ্যে বিশ বছর গত হয়েছে;— এ বাড়িতে কয়েকপাল সন্তান জন্ম নিয়েছে : কেউ বা হাফেজ মিয়ার বৌয়েদের পেটে, কেউ বা ছেলের বৌয়েদের পেটে, কেউ বা মেয়েদের পেটে। এরা সবাই বাড়ির মুরুব্বিদের কাছ থেকে হায়াত মিয়ার গল্পই শুনে এসেছে এতদিন। হায়াত মিয়া এদের কারো ভাই, কারো মামা, কারো বা চাচা। তাই তার আগমনি বার্তায় এদের কারোরি আনন্দের কমতি নেই।

দীর্ঘ বিশ বছর পর বাড়ি ফিরছে হায়াত মিয়া। হাফেজ মিয়ার সেই রাগ গত হয়েছে কবে! বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাফেজ মিয়া বলতে থাকে, "ছোট বৌ, হের জন্যি ডিমের হালুয়া তৈয়ার করতি ভুলু না যেনে। আর সাদিক, খোঁজ নে ওরা হায়াতকে আনতি রওনা হলু কি না। মা আছিয়া, ঘর দুয়ার গোছগাছ করি রাখ। কেউ একজন মজিদরে ক', লাশটা মাটি দি পুকুরের সবথেকি মোটা মাছটা ধরতি।"

গ.

কবর খোঁড়া শেষ। লাশটা চাটাইয়ের তলে পড়েই আছে। মজিদ মসজিদের ইমামের কাছে গিয়েছিল জানাজার জন্য। ইমাম বলেছিলেন, "বেওয়ারিশ লাশ, হিন্দু না মুসলিম কে জানে! আমি তার জানাজায় যেতি পারব না।" মজিদ বলেছিল, "হুজুর, লাশের আবার হিন্দু আর মসুলমান কী? আর তাছাড়া হেই মুসলমান, আমি কাপড় উঠাইয়ে দেখছিলাম একবার।" হুজুর ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, জানাজার মানে বুঝিস?— আল্লার কাছে মূর্দার সাক্ষি দেওয়া। যার কিছুই আমি জানি না, তার সাক্ষি দেব কেমনে?" "ওই পাড়ার মমিন সম্পর্কে তো জানতেন, সে পাকা চোর আছিল, বৌ না পিটালি ভাত হজম হতু না। হের জানাজা তো ঠিকই পড়ালেন?" মজিদের এই কথায় হুজুর তেলে বেগুনে তেঁতে ওঠে,— "যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! মিয়া বাড়ির চাকর না হলি থাবড়ায়ে তোর দাঁত আমি খুলি দিতাম।"

উপায়ান্তর না দেখে মজিদ আর রাজা লাশ কবরের কাছে নেয়ার ব্যবস্থা করল। আম্বিয়াও হাত লাগাল। আম্বিয়া এ বাড়ির অনেক পুরোনো কাজের মানুষ। লাশটি অনেকক্ষণ পানিতে থাকাতে ফুলে ফেঁপে একাকার অবস্থা। মুখমণ্ডলের মাংস মাছে খাবলে খুবলে বিশ্রী অবস্থা করে দিয়েছে— চেনবার কোনো জো নেই।

"আহা রে! মানুষটা বড় সাহেবের লাহান লম্বা চওড়া, কার বাড়ির ছেলে কে জানে? হের মা বাপ নিশ্চয় হের জন্যি অপেক্ষা করছি।" আম্বিয়ার কথা শুনে মজিদ তেড়ে ওঠে— "ওতো কতা না বুলি শক্ত করি ধরো, বড় সাহেব চলি আসলি আর কারো রক্ষ্যি থাকবি না।" লাশটিকে টেনে হিঁচড়ে কবরে নামায় ওরা। তারপর ফটাফট মাটি চাপা দেয়।

বাড়িতে হৈ রৈ বাড়তেই থাকে। দেখে বোঝার উপায় নেই, এ-বাড়ির গোরস্থানে এইমাত্র একটা লাশ দাফন করা হল। যারা গঞ্জে গিয়েছিল হায়াত মিয়াকে আনতে, সন্ধ্যা হয়ে এলো, তাদের কোনো খোঁজ নেই। একজনকে বলতে শোনা গেল, "গেল রাতে নাকি লঞ্চডুবি হয়েছে, তাই বোধহয় বড়সাহেবের আসতে এতো দেরি হচ্ছে।"

প্রকাশ : *উচ্চারণ*

মসজিদ

ক.

জুম্মার আযানের পর ইমাম সাহেব আজ নিজে মাইকে দাঁড়িয়ে সকলকে মসজিদে আসার জন্য বলেছেন। গ্রামের সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য ইমাম সাহেব যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি এইভাবে সকলকে সমবেত হওয়ার জন্য বলেন। ইমাম সাহেবের কথা ফেলবার সাধ্য কারও নেই। তাই আজ যারা নামায পড়ে না তারাও গেল। যাদের এখন ক্ষেতে পানি দেয়ার কথা ছিল তারাও গেল। যার একটি পা নেই, নাতি ছেলের কাঁধে ভর করে সেও গেল। আল্লাহর সাথে যার ভেতরে ভেতরে গভীর দ্বন্দ্ব, সেও গেল। গ্রামে যে কয়েকঘর হিন্দু-ডোমদের বাস ছিল, তারাও গেল— মসজিদের গেটে দাঁড়িয়ে রইল ঠাঁই, কেননা, আজ যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তার সাথে এদের স্বার্থও জড়িত।

ইমাম সাহেব শুরু করলেন : 'মুমিন, ঈমানদার ভাইয়েরা আমার! আপনারা ইতিমধ্যি টের পেয়িছেন, আল্লাহ আমাদের ওপর চরমভাবে নাখোশ। তাঁর অভিশাপ নাযিল হয়িছে এই রহমতগঞ্জের ওপর। মাঠে দাও দাও করি আগুন জ্বলছি। সোনার ফসল পুড়ি ছাঁই হয়ি যাচ্ছি। আল্লাহর আদেশে সূর্য তার শক্তির কেরামতি দেখাচ্ছি। সবাই না খেয়ি মরবি— আল্লাহর সাথে নাফোরমানি! দিলে আল্লাহর ভয়-ডোর আনো মিয়ারা, তুমাদের জন্যি আরো কঠিন দিন অপেক্ষা করছি। কথায় আছে, 'উন বর্ষায় দুনো শীত!' এইবার খরায় সব পুড়ি যাচ্ছি, পরের বার দেখবা বানের পানিতে বও-বাচ্চা সব ভেসি যাচ্ছি। তাই এখুনো সময় আছে, তুমাদের বাল-বাচ্চাদের বাচানুর।'

'হুজুর, আমরা গ্রামের ব্যাবাক মানুষই তো নামায পড়ি, তাহলি কেনে এই গজব?'— জানতে চাইলেন মুরুব্বি গোছের এক কৃষক।

'শুধু নামায পড়লি হবে মিয়া? এই মসজিদের দিকে একবার নজর দি' দেখ, — গেল পাঁচ বছর ধরি শুধু মেঝেটাতেই ইট পড়িছে। আল্লাহর ঘরকে এত অবহেলা করলি গজব নাজিল হবি না তো এমনি!'

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া গ্রামের একমাত্র ছেলেটি দাঁড়িয়ে গেল, 'হুজুর, ক্ষমা করবেন, মসজিদ পাকা হওয়া না হওয়ার সাথে খরার কী সম্পর্ক বুঝলাম না! দেশে তো আর পাকা মসজিদের অভাব নেই! খরা তো এখন দেশ জুড়েই। আর তাছাড়া, আমাদের গ্রামের সকলেই চাষি, পুরো গাঁয়ে চেয়ারম্যান সাহেব আর আপনার ঘর ছাড়া পাকা কোনো ঘর নেই। সুতরাং এই গায়ের মসজিদ কাচা হলি ক্ষতি কী?'

হুজুর তেলে বেগুনে তেঁতে উঠলেন— 'কি! আল্লাহর ঘরে বসি আল্লাহর সাথে নাফোরমানি? এই পোলাকে আজই গাঁ ছাড়া করতি হবে। মাদ্রাসায় শিক্ষা নিলি আজ ওর এই গতি হতুক না।'

খ.

কয়েকদিনের মধ্যে ইমামের নির্দেশ মোতাবেক মসজিদ পাকা করার কাজ শুরু করা হল। গ্রামের সকলে তাদের সাধ্যমতো দান করলো। যার সাধ্য নেই সেও কিছু দিলো। আম্বিয়ার বাপ এই দুর্ভিক্ষের মৌসুমে যে অল্প কটি ফসল ঘরে তুলেছিল তার সবটাই প্রায় ইমামের হাতে তুলে দিল। পশ্চিম পাড়ার শকুর তার একমাত্র হালের গরুটা আল্লাহর ঘর তৈরিতে সঁপে দিল। নারীরাও থেমে থাকে নি—কেউবা হাতের বালা, কেউবা কানের দুল, কেউবা গলার মালা। শিশুরা বাঁশের ফোঁকরে কিংবা মাটির ব্যাংকে আসছে মেলা থেকে রঙিন খেলনা কিনবে ভেবে যে দু' চারআনা পয়সা জমা করেছিল তাও দিয়ে দিলো। গ্রামে খরা কিংবা বন্যায় শহরের মানুষদের সহযোগিতা না পেলেও মসজিদের জন্য তারা দু'হাত ভরে দিলো।

মসজিদের দেয়াল তোলা হল। ছাদ করা হল। রঙ করা হল দেয়ালে। পাশের গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ আনা হল। মাইক লাগানো হল চতুর্দিক তাক করে। গুনে গুনে দশটি বৈদ্যুতিক বাতি ও ফ্যান সেট করা হল। আরব দেশ থেকে ইমাম আর চেয়ারম্যানের জন্য কাবাঘর আঁকা তুলার জায়নামায আনা হল। চেয়ারম্যান আর ইমাম সাহেব নাকি মসজিদের জন্য বিদেশ থেকে সাহায্য আনানোর ব্যবস্থা করছেন। তাদের ঘরেও রঙ করা হল একেবারে বিলেতি ধাঁচের।

'বার বার মিস্ত্রি-টিস্ত্রি আনা ঝামেলা, তা কী বলো ইমাম?'

'আমিও যা ভাবছিলাম'— উত্তরে ইমাম সাহেব বলেছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে বিনা মজুরে কাজ করলো গ্রামের শয়ে শয়ে মানুষ। মসজিদ শেষ হতে না হতেই মহামারী দেখা দিল গ্রাম জুড়ে। না খেতে পেয়ে মারা গেল শিশু, বৃদ্ধ, জোয়ানরাও। এতবড় প্রকট একটা মহামারীর মাঝেও টিকে গেল বেশ কিছু মানুষ, — আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী বলে কথা!

গ.

মজিদ তার ছয় বছরের ছেলে আর নয় বছরের মেয়েকে সকাল সকাল গোসল করিয়ে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরায়। মসজিদ দেখতে যাওয়া ওদের অনেক দিনের বায়না। আশেপাশের গ্রাম জুড়ে এখন মসজিদটা দর্শনীয় জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ বেশ ঘটা করে মসজিদে আসছে, ঘুরে ফিরে দেখছে চারপাশ। ময়না আর মজনু, মজিদ মিয়ার ছেলে-মেয়ে, আজ বেজায় খুশি। মজিদ মিয়া তার একহাতে মেয়েকে অন্যহাতে ছেলেকে ধরে বেশ আনন্দে পা বাড়ায় মসজিদের দিকে। মসজিদের গেটে এসে মজনু বাবার হাত গলিয়ে ছুটে যায় মসজিদের ভেতরে। 'অ্যারে অ্যারে একি করলি, পা খান ধুয়ে যা আর একবার!'— মজিদ চেঁচিয়ে বলে। ময়না বেশ যত্ন করে পা দুখানি ধুয়ে মসজিদে প্রবেশ করে। মজিদ মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করার আগে বেশ দ্বিধায় পড়ে যায়— এমন ফাটা পায়ে উঠলে আল্লাহর ঘরের চকচকে মেঝেতে যদি দাগ পড়ে যায়! মজিদ মসজিদের এক কোনোায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। 'এটা আমাগো মসজিদ, তাই না বাপজান?'— ময়নার যেন বিশ্বাসই হয় না। মজনু আর ময়না যে যার মতো করে মসজিদের ভেতর ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে তাকিয়ে মজনু অবাক হয়ে যায়। 'আব্বা, এইটা কেমনে ঘোরে?' 'সবই আল্লাহর কুদরত বাপ।'— উত্তর দেয় মজিদ। 'ফেরেসতারা ঘুরায়, তাই না বাপজান?'— ও পাশ থেকে বলে ময়না।

মজনুকে ভেতরে দেখে তেড়ে আসে ইমাম— 'এই, কার ছোকড়া এটা, হ্যাফপান্ট পরি ঢুকি পড়িছে? বের হ' বলছি।'

ইমামের কথা শুনে ছুটে যায় মজিদ— 'হুজুর, মাফ করবেন, এইডা আমার পুলা। কয়দিন থেকি মসজিদটা দেখতি চাচ্ছিল।'

'দেখতি চাচ্ছিল ভালো কথা। বাইরি থেকি দেখাবি। এইভাবে হ্যাফপ্যান্ট পরি কেও আল্লাহর ঘরে ঢোকে নাকি রে বেকুব! আর তোর পেছনে ঐ মহিলাডা কে?'

'আমার মেয়ি হুজুর।' ভয়ে ভয়ে বলে মজিদ।

'জানিসনি মেয়ি মানষের বেপর্দা হয়ি মসজিদে আসতি নেই?'

'হুজুর, হেয় আমার দুধের বাচ্চা। বাচ্চাদের ছেলি আর মেয়ি কী!'

'দুধের বাচ্চা, বুলিস কী! উকে দেখিই তো মনে হয় বিয়ের বয়স পার হয়ি যাচ্ছি।'

'না হুজুর, গেল মাঘে ওর বয়স আট হয়িছে।'

'এখনই তো বিয়ের উপযুক্ত সময়। নবী কারীম (সঃ) আয়েশা (রাঃ) কে যখন বি' করে তখন তাঁর বয়স ছয় বছর ছেল। শোন, তোর মেয়ি মাশআল্লাহ সুন্দর আছে। বি' নি তোকে ভাবতি হবে না। বিহানে একবার মক্তবে আসিস। কথা আছে।'

মজিদের মনটা কেমন জানি বিষিয়ে ওঠে। একহাতে মেয়ে অন্যহাতে ছেলেকে নিয়ে মজিদ মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে।

'আব্বা, আমাগো ঐ রকম বাড়ি হইব না? কী সুন্দর দেখতি! মনে হয় খালি দেখি আর দেখি!'

'ঐ রকম ঘর করতি মেলা ট্যাকা লাগে, তাই না বাপজান? অতো ট্যাকা বাপজান কুতায় পাবে!'

'তালি তো আল্লার মেলা ট্যাকা, তাইনা বু'?'

'মেলা ট্যাকা মানে! আল্লাহর কাছে বড় বড় ট্যাকার গাছ আছে, তাই না বাপজান?'

'হি! হি! হি!,' খিল খিল করে হেসে ওঠে ময়না, 'তোর মাথায় ঘেলু নেই। আল্লাহ দুনিয়ায় থাকে নাকি! আল্লাহর ঘর হচ্ছি ঐ আকাশের মেলা ওপরে!'

'তালি ঐ মসজিদে কিডা থাকে? হুজুর স্যার যে বুললু, ঐডা আল্লার ঘর?'

'তোকে আমি বুঝাতি পারবু না। বাপজান, উকে বুঝাও তো?'

'এই থামবি তুরা? আল্লাকে নি এসব কথা বুললি পাপ লাগবি।'

ঘ.

পরের বছর বর্ষা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে রহমতগঞ্জের ওপরে। গাঙের পানিতে ভেসে যায় মাঠ। নদীর বাঁধ ভেঙ্গে রাতারাতি ডুবে যায় রহমতগঞ্জের অর্ধেকেরও বেশি বাড়ি-ঘর। ভেসে যায় গবাদি পশুর সাথে মানুষও। মজিদ মিয়ার মাটির দেয়াল চাপা পড়ে মারা গেছে মজনু। ঘর-বাড়ি হারিয়ে মানুষ এখন মসজিদের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছে। মহিলা ও শিশুদের জন্য চেয়ারম্যান সাহেবের বৈঠকখানা ও পরিত্যক্ত গোয়ালঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে আশেপাশের গ্রামে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে।

'আল্লাহর কী কুদরত, এত দুর্যোগেও মসজিদটার কিছু হয়নি! এই মসজিদখান না থাকলি তুমরা কুতায় গি' দাঁড়াতিক? গ্রামের অর্ধেকেরও বেশি বাড়ি-ঘর পানিতে ভেসি গেল অথচ এই মসজিদের একটা ইটও ডুবলু না! সবাই আল্লার কাছে শুকরিয়া আদায় কর।'— হুজুর আজ জুম্মার খুতবায় বেশ কয়েকবার বললেন কথাটা।

'হুজুর, গেল বছর খরা গেল, এ বছর বানে ভেসি গেল গাঁ— আমরা এ কুন পাপের শাস্তি ভোগ করছি?'— বৃদ্ধলোকটা বলতে বলতে কেঁদে ফেললো।

"শাস্তির কথা কেনে বুলছেন? বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। আল্লাহ পাক কালামে বলছেন, তিনি যাদেরকে যত বেশি ভালোবাসেন তাদেরকে বিপদ দি' ততবেশি পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হলিই তো কাল কেয়ামতের

দিন জান্নাত অবধারিত। সুরা নাবা'য় আল্লাহ বলিছেন, 'সাবধানীদের জন্যি রয়িছে সাফল্য, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্দিন্নযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র।' এসব পাওয়া কি এতই সুজা? দুনিয়ার যত সুখ-শান্তি তো কাফের মুশরিকদের জন্যি। আল্লাহ আমাদের ভালোবাসেন বুলিই না এত পরীক্ষা— সবাই বলেন আলহাম্‌দুলিল্লাহ।"

'আলহামদুলল্লিহা'— সবার সাথে সাথে চোখ মুছতে মুছতে বৃদ্ধও বললেন।

নামায শেষ করে মসজিদের এক পাশে মজিদকে ডেকে নিয়ে যান হুজুর। ফিসফিস করে বলেন, 'আমার প্রস্তাবটা ভেবি দেখো মজিদ মিয়া। এই দুর্যোগের মাঝে তুমার পরিবারের একখান গতি হইবে।'

মজিদ কোনো কথা বলে না। গোরস্থানের দিকে পা বাড়ায় সে। গেল বছর অনাবৃষ্টিতে মা মরছে, এইবার অতিবৃষ্টিতে ছেলেটা গেল। আশ্রয় আর হালের গরুটা ভেসে গেল গাঙে; এখন মেয়েটার জীবনটাও বোধহয়...! গ্রামে এত বড় ক্ষতি আর কারও হয়নি। মজিদ হাঁটতে হাঁটতে থেমে যায়। পিছন ফিরে তাকায় সে। জলের মাঝখানে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ধবধবে সাদা মসজিদটা। 'আল্লাহ, তুমি আমাকে এত ভালোবাসো?!' মজিদ আবার হাঁটতে শুরু করে। জলের ভেতর কাঁপতে থাকে মসজিদটা।

প্রকাশ : *বেঙ্গলি টাইমস*

একটি সভ্যতার গল্প

ক.

সাত দিন হল বড় সাহেব অফিসে আসেন নি। আছিয়া আজও অনোক্ষণ বড় সাহেবের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের পেটের দিকে কয়েকবার তাকায় সে। "অভিশাপ!"— বিড় বিড় করে বলে আছিয়া। মন্থর গতিতে ওয়াশরুমের দিকে এগিয়ে যায়; টয়লেটগুলোর যে অবস্থা তাকালেই খিঁচিয়ে বমি বের হয়ে আসে। এদিক ওদিক খুব একটা তাকায় না আছিয়া। টয়লেটের কপাট লাগিয়ে পায়জামার ফিতা ঢিলা করে ওখানটাতে হাত দিয়ে দেখে— মাসিক হওয়ার ডেট এক সপ্তাহ পার হতে চলল। মাসিকের সময় তলপেটের ব্যথায় কুঁকড়ে যায় আছিয়া। এই ব্যথাটাই প্রতি মাসে তাকে কত শত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়। এইবার এত দেরি হওয়া দেখে আছিয়ার ভেতরটা একবারে শুকিয়ে গেছে। বাথরুমের কপাট খুলতেই কে বা কারা যেন দ্রুত সরে পড়ে। আছিয়া বেশ ভালো করেই বোঝে মহিলাদের বাথরুমের পাশে এই সব পুরুষরা কেন এত ঘুরঘুর করে।

কাজে ফিরে যায় আছিয়া। সহকারী মহিলারা কী যেন একটা বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করছিল, আছিয়া দেখে থেমে গেল।

"রূপ আর গতর থাকলে কি আর এখানে পড়ে থাকি !"— চোখ টিপে এক মহিলা বলল ।

"আমি তো আর কম চেষ্টা করলাম না। বড় সাহেবের চোখ কি আর যেখানে সেখানে পড়ে !"— অন্য একজন বলল।

বড় সাহেবকে আসতে দেখে সকলে মনযোগ দেয় কাজে। অফিসের বড় সাহেব শমসের হাজী, গতবছরে একটা হজ্জ করে নামের শেষে ঘটা করে হাজী শব্দটা লাগিয়েছেন তিনি, বেশ কিছুক্ষণ ওদের কাজ পর্যবেক্ষণ করলেন।

'এই শোনো মেয়েরা, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী রাহেলা আক্তার আমার খুব কাছের মানুষ। তাঁর নির্দেশে একটা সংস্থা গার্মেন্টস মহিলাদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে জরিপ চালাচ্ছে। আমার এখানেও আসবে। নেগেটিভ কোনো কথা যেন আমি না শুনতে পাই। ঢাকায় একটা কাজ খুঁজে পাওয়া যে কত কঠিন তা নিশ্চয় সকলের জানা আছে!' কথাগুলো বলতে বলতে বড় সাহেব চেম্বারের দিকে পা বাড়ালেন।

খ.

ঐদিন আর বড় সাহেবের সাথে দেখা হয় না আছিয়ার। রাত দশটার দিকে ঘরে ফেরে সে। বস্তির এক কক্ষে ওরা ১৪ জন থাকে। আছিয়া থাকে রাধার চৌকির তলে। চৌকিতে থাকে রাধা আর রাধার তিন মেয়ে। চৌকির যা অবস্থা— কবে ভেঙ্গে না পড়ে! ঘরে ঢুকেই টয়লেটে যায় আছিয়া। পানি নেই। পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে তার। পুরানো একটা শাড়ির এক পাশ ছিঁড়ে টয়লেটে প্রবেশ করে সে। এই পরিস্থিতির সাথে এখানকার সকলে অভ্যস্থ। পানি না থাকার কারণে টয়লেটের মুখ মলে ভরে গেছে। কাজ সারতে সারতে বমি করে ফেলে আছিয়া। বাথরুম সেরে চৌকির তলে ঢুকে যায়। সকালে কাজে যাওয়ার সময় পিওন একখানা চিঠি দিয়েছিল। আছিয়া জানে চিঠির বক্তব্য কী। এখানে আসার পর থেকে একই চিঠি বারবার পড়ে আসছে সে—

"মা আছিয়া,

তোর বাবার শরীর ভালো না। ঔষধ কিনতে আরো টাকা লাগবে। তুই যা পাঠাস তাতে তোর বাপের কিছুই হয় না। তুই তো জানিস কত কষ্টে আমি সংসার চালাই। এবার পারলে কিছু ধরে পাঠাস। আর শরীরটার যত্ন নিস।

ইতি;

তোর চাচা।"

শরীরটার যত্ন নিস? শালা জুয়াখোর-মাতাল! চাচাকে গালি দিতে দিতে চিঠিটা খোলে আছিয়া। একবার চোখ বুলিয়ে মাথার কাছে রেখে দেয় সে। রত্নার ছেলে দুইটা এই যে শুরু করলো, সারারাত চলবে ওদের কান্না। রত্নার শুকনো বুকে মুখ লাগিয়ে কাঁদতে থাকে বাচ্চা দুটো আর রত্না অঘোরে ঘুমায়। আছিয়া নিজের বুকে হাত দিয়ে অনুভব করে এখনো শুকায়নি সে। চিঠিটা আবারো পড়ে।

"আছিয়া ঘুমালি নাকি ?" চৌকির ওপর থেকে জিজ্ঞেস করে রাধা।

"না।" উত্তর দেয় আছিয়া।

"এখনো তো মাস পুড়তে দিন দশেক বাকি! বাড়িতে কী পাঠাবি রে?"

"আর পাঠাতে হবে না দিদি!"

"মানে ? ওইটা তাইলে কার চিঠি?"

"মুক্তির চিঠি! এখন আমি মুক্ত দিদি! আমার আর কোনো পিছুটান রইল না।"

"কবে মরেছে চাচা?"

"গেল হপ্তায়।"

"তোর তো একবার বাড়ি যাওনের দরকার!"

"যাব না, কী হবে গিয়ে! কার কাছেই বা যাবো!"

"হুম। ঘুমা এখন। ভোরে আবার উঠতে হবে। এই মাগিরা চিৎ হয়ে শুস্ কেন, কাত হয়ে শো।"— রাধা মেয়েদেরকে গুতিয়ে গুতিয়ে নিজের জায়গা করে নেয় একপাশে। অন্যদিকে চেঁচিয়ে ওঠে মরিয়ম, "এই হারামজাদি রত্না, ছেলে সামলা বলছি। আমার বাচ্চা কী খাবে শুনি?" আছিয়া আর কোনো শব্দ করে না। চাটাইয়ের ছিদ্র দিয়ে পাশের বিল্ডিং এর এক ছটা আলো আছিয়ার মুখের ওপর এসে পড়ে। মাঝে মধ্যে ঘুম না আসলে আছিয়া ঐ ছিদ্র দিয়ে সামনের বিল্ডিংটির দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। ঢাকা শহরের বিল্ডিংগুলো নাকি খুবই নড়বড়ে। একটা যুৎসই ভূমিকম্প হলেই সব হুড়মুড় করে ধসে পড়বে আছিয়াদের উপর— মনে মনে প্রায়ই ভাবে আছিয়া। আছিয়া মুখের ওপর কাপড় টেনে নেয় : ঘুমানোর চেষ্টা করে আপ্রাণ। এই এক ছটা আলো ঘুমাতে দেয় না তাকে। আছিয়া চিৎ হয়ে চাটাইয়ের ছিদ্র দিয়ে বিল্ডিংটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বড় সাহেব এ রকমই উঁচু এক বিল্ডিং-এ থাকেন, ভাবে আছিয়া। কত ব্যবধান এখন ওদের মাঝে! অথচ বড় সাহেবের চেম্বারে, দেহের কাপড় গলে পড়ার সাথে সাথে এই ব্যবধান কোথায় যেন উবে যায়। আছিয়া বিস্মিত হয়ে পরখ করে তার দেহের শক্তি। কী আছে এই মাংসে— নিজের অজান্তেই তার হাত চলে যায় বুকে।

আছিয়া ঐ বিল্ডিং এর আলোয় চিঠিটা আবারো পড়ে। আজ তার খুব বেশি একা মনে হচ্ছে। দুঃখের না হউক সুখের ভাগ বসানোরও যে আর কেউ রইল না তার। চার বছর হল বাবাকে দেখেনি সে, অনুভবও করেনি খুব একটা। পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে কেউ তার জন্য অপেক্ষা করছে এই বিশ্বাসই তার একমাত্র সঙ্গী ছিল এতদিন। এই বিশ্বাসটুকু বাদ দিলে বাবার থাকা না থাকার কোনো মূল্যই নেই আছিয়ার কাছে।

গ.

বড় সাহেব ব্যবসার কাজে এক মাসের জন্য দেশের বাইরে চলে যায়, দেশে ফিরলে আছিয়ার আরো একমাস কেটে যায় তার সাক্ষাৎ পেতে।

"স্যার, আমি আপনার সন্তানের মা হতে চলেছি,"— বড় সাহেবের পা ধরে বলে আছিয়া।

"বেশ তো, বাচ্চা ফেলে দে।"— বড় সাহেব পা সরিয়ে নিয়ে বলেন।

"কিন্তু স্যার, ও ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই! ওকে যে আমার বড় দরকার!"

"তাহলে কিছু টাকা নিয়ে কেটে পড় এখান থেকে।"

"আপনি না আমাকে বিয়ে করার কথা বলেছিলেন?"

"আমি তো তোকে বুদ্ধিমান ভাবতাম। এখন দেখছি তুই খুবই বোকা!"

"স্যার, ওর পরিচয়টা দিয়ে দেন, আমি কথা দিচ্ছি অনেক দূরে চলে যাবো, আপনার কাছে আর আমার কিছুই চাওয়ার থাকবে না।"

বড় সাহেব মিটিং এর অজুহাতে অফিস থেকে বের হয়ে যায়। পরের সপ্তাহে বড় সাহেবকে ব্লাকমেইল করার অভিযোগে গার্মেন্টস থেকে বের করে দেওয়া হয় আছিয়াকে। রাধা সব শোনার পর আছিয়াকে গর্ভপাত করানোর জন্য অনুরোধ করে। বিভিন্নভাবে বোঝায় সে কিন্তু কিছুতেই আছিয়া রাজি হয় না। এই অনাগত শিশুই তার একমাত্র আপনজন, একে সে কিছুতেই হারাতে চায় না। ঢাকায় কোনো ঠাঁই খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায় গ্রামে চাচার কাছে। চাচার কাছেও আশ্রয় হয় না আছিয়ার। তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা নিয়ে গ্রামের মোড়ে মোড়ে জটলা পাকে। একপর্যায়ে শালিস ডেকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয় আছিয়াকে। নিরুদ্দেশ হয় আছিয়া।

বছর যেতে না যেতেই পরিচিত সকলেই ভুলে যায় আছিয়ার কথা। তাই বলে তার অস্তিত্ব বিলীন হয় না শূন্যে। এই সভ্যতার কোনো এক প্রান্তে সংগ্রাম চালিয়ে যায় সে। বছর তিনেকের মাথায় দিনাজপুরের এক জেলে কে যেন প্রথম আবিষ্কার করে আছিয়াকে। যে সন্তানকে ধারণ ও লালন করার অপরাধে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল একদিন, সেই সন্তানকে খুন করার সুবাদে তাকে আবার সমাজে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

ঘ.

যতদূর জানা যায়, আছিয়া বাঁচতেই চেয়েছিল এবং বাঁচাতে চেয়েছিল তার সন্তানকে, হয়ত এ জন্যই...!

জীবন যেখানে যেমন

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে;— হাত বাড়িয়ে দিই, ছুঁতে ইচ্ছে করছে প্রচণ্ড। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো হুড়িমুড়ি খেয়ে হাতে এসে পড়ছে; তারপর পাল্লা দিয়ে গলে পড়ছে হাতের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। ইট বিছানো মাটিতে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাচ্ছে প্রতিটির দেহ; শেষবারের মতন কঁকিয়ে উঠছে তীব্র বেদনায়। মাটি গভীর মমতায় শুষে নিচ্ছে বৃষ্টির বেদনাগুলো, নাকি গোগ্রাসে গিলছে বৃষ্টির আর্তনাদ, মেটাচ্ছে জন্মের পিপাসা? মানুষ হওয়ার এই এক অসুবিধে : কারণে-অকারণে অনেক ভাবনাই মাথায় আসে। ট্রেনটা নিশ্চয় এমন করে ভাবছে না!

ট্রেন ভেড়ামারায় এসে থামল, একজোড়া নারী-পুরুষ আমার সামনের আসনে এসে তড়িঘড়ি করে বসল। ট্রেন ছেড়ে দিল। বাম পাশের সিটে বসা যে মানুষটি এতক্ষণ বকর বকর করে মাছের হাট বানিয়ে রেখেছিল কামরাটি, সে তড়িৎ গতিতে ট্রেন থেকে নেমে গেল। লোকটি গল্পে এতটাই মশগুল ছিল যে, আর অল্পক্ষণ গত হলেই এখানে আর নামতে হত না তাকে। হঠাৎই আমার মনে হল, মাছের বাজার থেকে চলে এসেছি সোজা কাঁচামালের বাজারে যেখানে লোক সমাগমের ঘাটতি নেই বটে তবে জিনিসপত্রের দাম শুনে যেন বাকশূন্য জনতা ফ্যালফেলিয়ে চাইছে ইতি-উতি! পাশে বসা ছেলেটি আমার মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টিতে নেয়ে ওঠা প্রকৃতি দেখায় মহাব্যস্ত, যেন গোগ্রাসে গিলছে বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির আটসাঁট যৌবন। পৃথিবীতে লম্বা হওয়ার যতগুলো সুবিধা আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অনায়াসে অনেক কিছু দেখতে পাওয়া। ও যে আমার থেকে অনেক লম্বা এই বিষয়টি আমাকে বোঝানোর জন্য থেকে থেকে আমার মাথায় ওপর দিয়ে হাত চালিয়ে দিচ্ছে জানালার দিকে।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে;— আমি বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলাম। বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতি এখন নিশ্চুপ যেন সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু এইমাত্র পেট পুরে খেল, এখন তার ঘুমানোর পালা। প্রকৃতির এই নিষ্পাপ চেহারা আজই প্রত্যক্ষ করছি তা কিন্তু নয়; ইতোপূর্বে বহুবার করেছি, তবে আজকের এই অনুভূতি আজই প্রথম। ট্রেনের শব্দটা এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে ঘুমপাড়ানি গান; প্রকৃতিকে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত

সে এখন। এই মুহূর্তে মা'র কথা মনে পড়ছে খুব করে। মা গান জানতেন না। সংসারের সাতকাহন সামলাতে গিয়ে গান গাওয়া কিংবা শোনার ফুসরৎ মেলেনি তাঁর। সাতবোকার একটি গল্প জানতেন এবং এই একটি গল্প দিয়েই তাঁর ন'টি সন্তানকে ঘুম পাড়িয়েছেন। তারপর একদিন ক্লান্ত হয়ে তিনি নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বোনেরা মার কানের কাছে সুর করে কালিমা তাইয়্যেবা পাঠ করছিলেন। ঘুম পাড়ানোর এই তরিকা আমি সে দিনই প্রথম পর্যবেক্ষণ করলাম। তবে আমার ধারণা, ঐ সময় পৃথিবীর কোনো শব্দই মার কানে প্রবেশ করেনি। ধ্যান করার প্রথম কারণ হচ্ছে নিজের চারপাশে ভ্যাকুয়ম বলয় সৃষ্টি করা। নিজের সত্তাকে transcend করানো মানেই হচ্ছে তাকে শব্দের জগত থেকে বের করে আনা। এবং সোল যখন পারফেক্টলি transcend করে তখনই তো আমরা বডি ধরে কান্নাকাটি করি! আমরা যাকে মৃত্যু বলি সে শুধু দেহেরই ঘটে; আমাদের ভালোবাসা শুধুই বস্তুকে ঘিরে। মানুষের যদি দৃষ্টি না থাকতো তাহলে বস্তুর আবেদন অনেকখানি কমে যেত; এক্ষেত্রে প্রাণিকুলের সেরা জীব হত বানর গোছের কিছু একটা।

খ.

সামনের আসনে বসা নারী-পুরুষ দুটি পরস্পরের হাত ধরে একটি করে কথা বলছে আর অট্টহাসিতে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে। দুজনেরই বয়স ২৮ থেকে ৩৫ এর মধ্যে হবে; আচরণে মনে হচ্ছে সদ্য বিবাহ হয়েছে। সদ্য বলছি এ জন্য যে, বেশি দিন সংসার করা নারী-পুরুষেরা বাইরে এসেও সংসারের গাণিতিক হিসাব মেলাতে ব্যস্ত থাকেন; ভালোবাসা তাদের কাছে মধ্যরাতের বিছানাতেই শোভা পায়। তবে এরা প্রেমিক-প্রেমিকাও হতে পারে। চার্লস ল্যাম্ব আজীবন ব্যাচেলর ছিলেন। তাঁর একটি রচনায় লিখেছিলেন যে, তিনি কোনো বিবাহিত বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে তাঁর সামনে এমন ভান করে যেন তারা প্রচণ্ডভাবে একে অপরকে ভালোবাসে এবং তারা ল্যাম্বকে বলতে চায়, দেখ ব্যাটা তুই কত অসুখী! এরা দুজন কি এখন আমাদেরকে সুযোগ পেয়ে সেরকমই কিছু ইঙ্গিত করছে? না হলে বউকে নিয়ে তো ঘরের মধ্যে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে লটর-পটর করতে পারে! এভাবে ট্রেনের তালে তালে একে অন্যের গায়ে হেলে পড়ার মানে কী! আমার বামদিকের কোনায় মাঝবয়সী এক হুজুর বসে আছে। হুজুরটি সুবিধা মতো এঙ্গেলে আমার সামনের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে; তাকানোর ভঙ্গিমাটা এমন যেন ক্ষুধার্ত মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হোটেলে কাচ দিয়ে ঘেরা মিষ্টি দেখছে, পেলেই টপাটপ গিলে ফেলবে। মেয়েরা যদি খাদ্য হয় তবে আমরা যাকে চরিত্রহীন বলি তাকে ভোজনরসিক বললেও

চলে। শুনতে খারাপ লাগলেও অনেকে একমত হবে, মেয়েরা পুরুষদের কাছে খাবারই বটে। পার্থক্য হচ্ছে, এদেরকে ডাইনিং টেবিলে পরিবেশন না করে বিছানাতে করা হয়। আমাদের দেশে হুজুরদের বিনোদনের মাধ্যম বলতে শুধুমাত্র স্ত্রী মানে নারী আর কী, ফলে হুজুরদের বৌদের বেশ ধকল সহ্য করতে হয়। আমার দূর সম্পর্কের এক ভাবীকে, যার স্বামী বেশ নামকরা হুজুর ছিলেন, বলতে শুনেছিলাম যে, তার স্বামীর ভালোবাসা এখন তার কাছে অত্যাচারের মতন মনে হয়। দিন নেই রাত নেই যখন তখন...!

একটু ঝিমুনি এসেছে মাত্র এমন সময় একটা হাতের আলতো পরশে হতচকিয়ে উঠলাম; দেখি একজন অর্ধউলঙ্গ ভিখারী সমস্ত হাত জুড়ে খ্যাত খ্যাতে ঘা, বৃষ্টির পানিতে ভিজে হাতটির দশা বর্ষায় আমার পাড়ার গলির মতো : গরুর গোবর, চুনার সাথে টয়লেটের ট্যাংক উপচে পড়া নোংরা আর ড্রেনের পানির এক অদ্ভূত মিশ্রণ! লোকটির চারিদিকে মাছি ভন ভন করছে। আমার তো প্রায় বমি হবার উপক্রম। আমি ঝট করে চোখ সরিয়ে নিলাম। লোকটি হাত প্রসারিত করে বলতে থাকে, 'ভাই-আফারা, শরীরে আমার কঠিন ব্যামো, আল্লার বান্দা, দু-এক টাকা দিয়ে সাহায্য করেন, আল্লাহ আপনাগো মঙ্গল করবে।' মনে হচ্ছে এই ব্যামোটাই ওর ব্যাবসায়ের মূলধন। ভিক্ষাবৃত্তিকে যদি এক ধরনের ব্যবসা বলা হয় তবে আমাদের দেশে এই ব্যবসায় শুধু আল্লাহর নাম এবং আল-কুরআনের দু-একটি লাইন জানা থাকলেই চলে। আমার মন বলছে আরেকবার লোকটির হাতের দিকে তাকাতে, কিন্তু আমি জানি তাকালে এই মনই ভেতর থেকে বমি খিচিয়ে বের করে আনবে। মনের একই সাথে এই দ্বিমুখী আচরণে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। এই বিশ্রী জিনিসটার প্রতি তার এত টান কিসের!

ফকিরটা যেতে না যেতেই এক হকার এসে শুরু করলো তার তোষামুদে বক্তৃতা। কথা বলা যে লোক ঠেকানোর এবং ঠকানোর জন্য খুবই কার্যকরী এক শিল্প তা এই হকার এবং রাজনীতিবিদদের বক্তব্য শুনলে বোঝা যায়। একজন চকলেট বিক্রেতাও আমাদের কামরায় প্রবেশ করল। 'ভাই-বোনেরা আমার, আমি অন্ধ মানুষ, চকলেট বিক্রি করি পেট চালাই, সবাই একটি করে চকলেট কিনি সাহায্য করেন', বলেই বিক্রেতা এদিক ওদিক হাত বাড়িয়ে দিল। লোকটিকে আমার বেশ ভালো লাগল।

এমনিতেই মানুষ অলস জাতের প্রাণী; বসার অবকাশ পেলেই ঘুমানোর চিন্তা করে। কিন্তু এই মানুষটার কণ্ঠে কী যেন একটা পেলাম! সৃষ্টিকর্তা লোকটির দেখার শক্তি কেড়ে নিলেও মনের শক্তি কেড়ে নিতে পারেন নি। সৃষ্টিকর্তার এই পরাজয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও খুশি হবেন নিশ্চয়।

গ.

ট্রেন সমান মমতায় সকলকে তার বুকে আশ্রয় দিয়েছে। ট্রেনের কাছে জাত ধর্ম ভেদাভেদ নেই। হয়ত নিজের কোনো জাত-ধর্ম নেই বলেই! আর আমরা মানুষেরা দশ জন একজায়গায় হলেই একটি শ্রেণী গড়ে তুলি। তাই তো কৌশলে ট্রেনের ভেতরটাকে বিভক্ত করা হয়েছে— প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণীতে। দারিদ্র্যকে এত ভয় কিসের! সমাজের সকলে যদি সত্যি-সত্যিই চাই তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে দারিদ্র্যকে দেখতে হলে জাদুঘরে যেতে হবে— কোনো সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু দারিদ্র্য আর ধর্ম এই দুটো জিনিস না থাকলে যে ওদের বড় ধরনের সর্বনাশ হয়ে যাবে! মানুষ হয়ে মানুষকে ঠকানোর এর থেকে মস্ত হাতিয়ার যে এখানো আবিষ্কার হয়নি।

পিছনের কামরায় একজন তিলের খাজা বিক্রেতা একটা বাচ্চা মেয়ের পাশে অনেকক্ষণ থেকে ঘুর ঘুর করছে। মেয়েটির বোধহয় তিলের খাজা পছন্দের না। বিক্রেতা আমাদের কামরায় চলে আসল। 'নেবেন ভাই, কুষ্টিয়ার বিখ্যাত তিলের খাজা'—লোকটি গড় গড় করে বেশ কয়েকবার বলল। আমি লোকটাকে চিনি, বাড়ি ফরিদপুরে। তিলের খাজাও ওখানকার। আমার চোখে চোখ পড়তেই দ্রুত অন্য বগিতে চলে গেল। একবার এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'পৃথিবীর কোনো জিনিসটা আপনার দেখতে সব থেকে বেশি ভালো লাগে?' 'অপরাধ ধরা পড়ার পর একজন অপরাধীর চেহারা'— উত্তরে ভদ্রলোকটি বলেছিলেন।

ট্রেনটি এইমাত্র পাকশি ব্রিজের উপর পা রাখলো। ট্রেনের ক্ষেত্রে পা না বলে চাকা বলাই ভালো। তবে আজ এ Personification টা বেশ গুরুত্ব বহন করে;— অন্তত আমার কাছে। এখন বর্ষাকাল। নদীর ভরা যৌবন উথলে পড়ছে। প্রকৃতিকে যারা ভোগ করতে জানে তাদের কাছে এ এক অসম্ভব শুভ সময়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিংবা জীবনানন্দ যদি আজ ট্রেনে থাকতেন আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এখনই জন্ম হয়ে যেত বেশ কিছু কবিতার। আমার এই মুহূর্তেই ইচ্ছে করছে নদীর বুকে লাফিয়ে পড়ি। প্রকৃতির কাছে এর থেকে সুখের আত্মসমর্পণ আর হতে পারে না! উঁচুতে উঠলেই মানুষের মনে এক ধরনের লাফ দেয়ার প্রবণতা কাজ করে। দর্শনের ভাষায় একে বলা হয়, Antipathitic-Sympathy, Sympathetic-Antipathy। শেষ পর্যন্ত লাফ আর দেয়া হল না। ট্রেন এখন স্থলদেশে। এখানে লাফ দেওয়ার মাঝে কোনো রোমান্টিকতা নেই। মাঝখান থেকে শুধু শুধু দেহের হাড়গোড়গুলো হারানো। ট্রেন এখন ঈশ্বরদীর খুব কাছাকাছি। ওখানে গিয়ে ট্রেনটি কিছুটা সময় জিরিয়ে নেবে। সেই সাথে আমি চা গেলার কাজটি সেরে নেবো। চা খেলে নাকি বুদ্ধি খোলে— এই কথাটি কবে যেন শুনেছিলাম! কথাটি শোনার পর থেকে চা পান করার পর নিজেকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়।

ঘ.

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন ঈশ্বরদী থেকে রাজশাহী অভিমুখে ছেড়ে যাবে। আমার সামনে বসা জুটিটা এখন বাদাম খাচ্ছে। আমার দূর সম্পর্কের এক মামা বাদামকে বলতেন প্রেমফল; দুজনার খাওয়ার ভঙ্গিমা দেখে আজ তার কথার সত্যতা মিললো। মহিলাটি আমার দিকে বাদামের ঠোঙাটি এগিয়ে ধরে বললেন, 'নেন ভাই, বাদাম খান।' আমি বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করতে গেলে পাশের জনটি বলল, 'আপনার আপা এত করে যখন বলছে, নেন না!' কয়েকটা বাদাম ঠোঙা থেকে উঠিয়ে নিলাম। না এরা বোধহয় বিবাহিত না। বিবাহিত হলে লোকটি 'আপনার আপা' না বলে বলত 'আপনার ভাবি'; এক্ষেত্রে সচরাচর এমনটিই ঘটে। এখন মনে হচ্ছে আমার দ্বিতীয় ধারণাটাই ঠিক।

একটা অল্প বয়স্কা মেয়েকে কয়েকজন ধরে আমাদের বগিতে উঠালো। মেয়েটি চিৎকার দিয়ে বুক চাপড়িয়ে কাঁদছে। কান্নার ভাষা বোঝার চেষ্টা করলাম। বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না তবে প্রতিটি বাক্যের আগে অথবা পিছনে মা শব্দটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটির মা মারা গেছে বিষয়টি বুঝতে বেশি সময় লাগেনি। বেশ দুঃখের কথা, কিন্তু আমি কেমন যেন একটা স্বস্তি অনুভব করলাম। অনুভবে— যে মারা গেছে সে অন্য কেউ, আমি না কিংবা আমার কেউ না। 'ইভান ঈলিচের' মৃত্যুর সংবাদ পড়ে তার বন্ধুদের এমনটি মনে হয়েছিল। মেয়েটি কাঁদছে বিরতিহীন।

আশেপাশের সকলে মেয়েটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে পাশের মা গোছের মহিলাটি মেয়েটির খসে পড়া বুকের কাপড় ঠিক করে দিলেন। আমার যখন মা মারা গিয়েছিল আমিও তখন এমনি করে কেঁদেছিলাম, আমার নানি মারা গেলে মা কেঁদেছিলেন; এ কান্না বংশ পরম্পরায় হয়ে আসছে, খুবই স্বাভাবিক, খুবই চিরন্তন এই কান্না। একেক কান্নার অ্যাপিল আবার একেক রকমের হয়; শিক্ষকদের পিটুনি খেয়ে যে কান্না তাতে থাকে অপমান, বাবার বকুনি খেয়ে যে কান্না থাকে তাতে থাকে জেদ, মার বকা খেয়ে যে কান্না তাতে থাকে অভিমান, স্বামীর বকুনি খেয়ে যে কান্না তাতে থাকে জ্বালা, আর আপনজন হারানোর যে কান্না তাতে থাকে বিস্ময়কর আবেদন। যে আবেদনে সাড়া দিতে গিয়ে এখন ট্রেনের এই বগিতে বেশ মেঘলা আবহাওয়া বিরাজ করছে। সন্ধ্যার সমস্ত নীরবতাকে ভেদ করে মানব জীবনের সবচেয়ে অসহায়ত্বটি ট্রেনের কামরায় কামরায় উত্তর খুঁজে ফিরছে। বিশ্বাসীরা অস্থির হয়ে উঠেছে, সংশয়বাদীরা নড়েচড়ে বসছে, অবিশ্বাসীরা চুপচাপ বসে আছে। ট্রেনটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সামনে এসে থামলো; এখানে থামার কথা না, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা ছাত্র চেইন টেনেছে। আমার পাশের লম্বুটি প্রথমবারের মতো রাজশাহী আসছে, ও ভেবেছে এটাই রাজশাহী স্টেশন!

ট্রেন স্টেশনে প্রবেশ করছে; অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা নেমে পড়বো। আমার জায়গায় অন্য কেউ আসবে, অন্যভাবে ভাববে সবকিছু, বাস্তবের চরিত্রগুলো কিছুক্ষণের জন্য হয়ে উঠবে গল্প জগতের বাসিন্দা।

মাস কতক পরে কুষ্টিয়ার সোনালী বাজারে আমার সামনে বসা লোকটির সাথে দেখা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপা কেমন আছে? 'ও এখন শ্বশুর বাড়িতে, ভালো আছে'— লোকটি হাসতে হাসতে বলেছিল। তাদের সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত রহস্যই থেকে গেল।

প্রকাশ : *স্নান, কৃষ্ণচূড়া, সোনাঝুরি*

ট্রিটমেন্ট

ক.

ছয়মন বানুকে মহল্লা ছাড়া করার সাত দিন হতে না হতেই গ্রামের উত্তর দিকের শেষ ঘরটিতে প্রথম কে যেন বলল,

—সফেলা বেশ্যা। আমি নিজ কানে শুনে এলাম।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে মহল্লার সকলে বলল,

—সফেলা বেশ্যা।

মাসখানেকের মধ্যে গ্রামের সকলে জানলো,

—সফেলা বেশ্যা।

গ্রামের প্রতিটা ঘরে ঘরে, মোড়ে মোড়ে, দোকানে দোকানে আলোচনা হচ্ছে,

—সফেলা বেশ্যা।

আলোচনার সুবিধার্থে, গ্রামের মোড়ে মোড়ে মাচান বসানো হয়েছে। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে মহিলাদের বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিনই। সদ্য স্কুলে পা দেওয়া ছেলেমেয়েরাও তাদের স্বভাবজাত আড্ডা ছেড়ে মেতে উঠেছে,

—সফেলা বেশ্যা।

খ.

গ্রামের মহিলারা দলে দলে জমায়েত হচ্ছে। তাদের এখন নাওয়া-খাওয়া কোনো কিছুই ঠিক মতো হচ্ছে না। স্বামীর দিকে নজর রাখতে রাখতে বেশির ভাগই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পুরুষদের জন্য বাড়িতে এখন ১১-ধারা জারি করা হয়েছে, সূর্যের আগে ঘরে ফিরতে হবে!

সকলের মধ্য থেকে প্রথম কথা বলে মাঝবয়সী এক মহিলা,

—আমার মরদের ঈদ লাগছে, সবসময় গুনগুনিয়ে সিনেমার গীত গায়।

আরেকজন বলে,

—আমার মরদ কাজের বাহানাতে বাড়িতে ঢুকতেই চায় না।

সব থেকে রুগ্ন গড়নের মহিলাটি বলে,

—আমার স্বামী তো সারা রাত বিছানায় ইশপিশ করে। ঠিক মতো খাওন-দাওন করে না। মনে হয় ঐ মাগির ভূতে ধরছে।

সকলের মধ্যে থেকে স্বাস্থ্যবতী মহিলাটি বলে,

—গ্রামের সব পুরুষদেরই এখন একই অবস্থা।

সবথেকে বয়স্কজন বলে ওঠে,

—হবে না! মিনসেদের কী দোষ বল? হুনছি, ঐ মাগির গতর থেকে রস নাকি চুইয়ে চুইয়ে পড়ে! মধু যেখানে থাকবি, মাছি তো সেখানে ভন ভন করবিই। তাই তোগো মরদগেরে বেশি চাপাচাপি না কইরা ঐ খানকিরে আগে গ্রাম ছাড়নের ব্যবস্থা কর।

একজন মহিলা তার পাশের জনকে বলে,

—আমার দেবর বলছিল, তোর ভাতার নাকি আজকাল ঐ মাগির বাড়ির পাশে খুব ঘুর ঘুর করে?

মহিলা ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে,

—এই, আমার কুদ্দুসের বাপেরে নিয়ে একটাও আজেবাজে কথা কবি না কইলাম! কেনে, তুই আর তোর দেবরের ফস্টিনস্টির ঘটনাটা মনে হয় আমরা জানি না?

বয়স্ক মহিলাটা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

—এই, নিজেদের গায়ে কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ কর তোরা। আগে মাগির স্যাটায় আগুন দিই, তারপর তোরা যত ইচ্ছে খিস্তি করিস।

গ.

গ্রামের সকলে বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেম্বার বাড়ির বৈঠকখানায় পঞ্চায়েত ডাকা হল। মিটিং শেষে মসজিদের মাইকে ঘোষণা করা হল,

—আগামীকাল বাদ জুম্মা, গ্রামের সকল মুমিন ভাইদের ঈদগার ময়দানে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে। ইমাম সাহেব ইসলামী শরিয়া আইন মোতাবেক বেশ্যা সফেলার (নাউজুবিল্লাহ, আস্‌তগ্‌ফিরুল্লাহ) বিচার করবেন।

পরদিন, যথারীতি জুম্মার নামাযের পর গ্রামের সকলে দলে দলে জমায়েত হল। এ পর্যন্ত কোনো ঈদে এত মানুষ এ ময়দানে জমায়েত হয়নি। ইমাম সাহেব তার বয়ান শুরু করলেন,

—প্রিয় ইমানদার ভাইয়েরা আমার, আমরা সকলে পবিত্র জুম্মার পর ওজু অবস্থায় এই ঈদগাহে হাজির হয়েছি একটা নেক মকছেদ পূরণ করার জন্য। গ্রামে আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছে। আপনাদের দান খয়রাতের হাত দিনে দিনে ছোট

হয়ে যাচ্ছে, তাই এই গজব। আজ আমরা একত্রিত হয়েছি, এক বেগানা মহিলার বিচার করার জন্য। ঐ নাপাক মহিলার নাম আজ মুখে নেয়াও পাপ। আল্লাহর পাক কালামে আছে, মহিলারা জ্যান্ত শয়তান, তারা মানব জাতিকে ধ্বংসের দিকে টানে! এজন্যই তাদেরকে টাইটের মধ্যে রাখার নির্দেশ আছে।

এখন বলেন, আপনারা সকলে কি ঐ বেগানা মহিলার পাপ কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন? থাকলে আওয়াজ তোলেন।

সকলে উচ্চস্বরে বলে ওঠে,

—হ্যাঁ হুজুর, আছি।

হঠাৎ এত জোরে শব্দ হওয়াতে আশেপাশের গাছপালা থেকে পাখিরা সব ঝটপট করে যে যার মতো রুদ্ধশ্বাসে উড়ে যায়।

—আপনারা কি আল্লাহর পাক কালাম বুকে নিয়ে সাক্ষি দিতে পারবেন? পারলে আওয়াজ তোলেন।

আবার প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল মাটি।

কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে হুজুর আবারো বললেন,

—এখানে আজ গ্রামের সকলে উপস্থিত আছেন। কারা কারা ঐ বেগানা মহিলার কাছে গিয়ে নাপাক হয়েছেন, আওয়াজ তোলেন।

এবার আর কোনো শব্দ হল না। যে কাশছিল, সে তড়িঘড়ি করে কাশি বন্ধ করে ফেলল। যারা ফিসফাস করছিল তারাও মুখ এঁটে রইল। কিছুক্ষণের জন্য জনশূন্য হয়ে পড়ল সমস্ত মাঠ।

—যদি কেউ থেকে থাকেন, আপনারা মসজিদে কিছু টাকা অথবা ফসল দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। ঐ বেগানা মহিলার শাস্তি হওয়া দরকার। চরম শাস্তি, যা দেখে দ্বিতীয়বার কেউ এ পথে পা বাড়ানোর সাহস পাবে না। আপনারা কী বলেন?

আবারো শব্দ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল মাঠ।

শরিয়া আইন মোতাবেক, কাল স্কুল ময়দানে ঐ বেগানা মহিলার গায়ে একশবার দোর্‌রা মারা হবে। আপনারা কী বলেন?

শেষবারের মতন শব্দ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল চারপাশ।

পরদিন, বাদ আছর, স্কুল ময়দানে সমস্ত গ্রামবাসীর সামনে সফেলাকে বেত্রাঘাত করা হল। গ্রামের মেম্বার, হেড মাস্টার, ইমাম, চোর, বাটপার সকলে পালাক্রমে দোর্‌রা মারলো। মহিলারা ঘেন্নায় স্যান্ডেল ছুড়ে মারলো। মাঝপথে সফেলা নিশ্চুপ হয়ে পড়লো, তবুও ডোজ কমপ্লিট করা হল। রাতে ভৈরব ঘাটে পুঁতে ফেলা হল সফেলার দেহ।

ঘ.

সফেলার এক মাস যেতে না যেতেই, গ্রামের দক্ষিণ দিকের শেষ বাড়িটাতে কে যেন প্রথম বলল,

—আকলির মা বেশ্যা। আমি নিজ কানে শুনেছি।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে মহল্লার সকলে বলল,

—আকলির মা বেশ্যা।

মাসখানেকের মধ্যে গ্রামের সকলে জানল,

—আকলির মা বেশ্যা।

এখন গ্রামের প্রতিটা ঘরে ঘরে, প্রতিটা মোড়ে মোড়ে, দোকানে দোকানে আলোচনা হচ্ছে,

—আকলির মা বেশ্যা।

প্রকাশ : *বন্ধুপত্র, সোনাঝুরি*

সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ গল্প

বিয়ের আগে :

আজ শীলার জন্মদিন। বাবা কিছুতেই যেতে দিল না। অনেক করে বললাম— নিলু, নাজমা, নাইছু, ডাক্তার আঙ্কেলের মেয়ে সকলেই যাচ্ছে; আরো বললাম— সন্ধ্যে হবার আগেই বাড়ি ফিরে আসবো, তবুও না। বাবা না বললে সেটাকে হ্যাঁ করাই কার সাধ্য! হেলাল সাহেব আমার বাবা। একমাত্র অফিসের বস ছাড়া কারও কথাই শোনেন না তিনি। বস যা বলেন সবকিছুই মেনে নেন আর বসের ওপরের রাগটা এসে আমার আর মার ওপরে দেখান। মা নীরবে মেনে নেন, আমিও। মা প্রায়ই বলেন, 'তোর বাপ পুরুষ মানুষ, বাইরের কত ঝামেলা-ঝক্কি সহ্য করতে হয়, রাগ তো একটু করবেনই।' আমি কোনো কথা বলিনি— না মাকে, না বাবাকে। ওরা এখন নিশ্চয় খুব মজা করছে!

বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। এই বাড়িটার আবার সামনে এবং পিছনে দুই দিকেই বারান্দা আছে। পিছন বারান্দা থেকে সড়ক দেখা যায়, গাড়ি আর জ্বলন্ত মানুষ দেখতে আমার ভালোই লাগে। মনে হয়, এই রোবটের জগতে আমিই একমাত্র মানুষ। এখন আমি সামনের বারান্দায়। এখান থেকে খাঁখাঁ শূন্যতা দেখা যায়। দূরে একটি স্কুল মাঠ, ওখানে সকালে স্কুলের ছেলেরা এবং বিকালে মহল্লার ছেলেরা খেলা করে। নাম না জানলেও ওদের সবাইকে আমি চিনি। প্রতিদিন আমি বারান্দায় বসে খুঁজে বের করি নতুন কে কে যোগ দিল— এভাবে আমি ওদেরকে নিয়ে খেলি।

আজ আবহাওয়াটা বেশ গুমোট, বাতাস বোধহয় বিল্ডিংগুলোর ওপাশে আটকে গেছে। বারান্দার চেয়ারটিতে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। মা বলেছেন, আজ ছুটির দিন, ভাইয়া এবং বাবার কিছু কাপড় কেচে দিতে। ভাইয়া অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। ওরা কলেজ থেকে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছে; বলেছে, আমার জন্য কক্সবাজারের অপরূপ দৃশ্যের অনেক অনেক ছবি তুলে আনবে, আর কত কত শামুকের কসমেটিক্স নিয়ে আসবে— আমি বলেছি আনতে। 'মা চন্দ্রা, তপনের কাপড়গুলো ভিজিয়ে রাখলাম; গোসলের আগে কেচে রোদে দিস।' ভাইয়ার নাম তপন— মামারা আদর করে রেখেছিল। আমার নাম চন্দ্রাই থাক— দাদা বলেছিলেন। দাদা আমাকে খুব

ভালোবাসতেন। সবসময় দাদাভাই দাদাভাই করে ডাকতেন, আমাকে গভীর রাত পর্যন্ত নানার অতীত জীবনের বীরত্বের গল্প শোনাতেন, যার বেশিরভাগই বানানো— আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম।

মা আবারো ডাকলেন। আমার আজ পানি নাড়তে ইচ্ছে করছে না। তবুও কাপড়গুলো কেচে ছাদে শুকাতে দিয়ে রুমে এলাম। আজ শীলার জন্মদিনে যাব বলে বেগুনি রঙের সালোয়ার-কামিজটা বের করে রেখেছিলাম। একবার ভেবেছিলাম শাড়ি পরবো। নাজমা বলল, ওরা কেউই শাড়ি পরবে না। এখন আমি ইচ্ছে করলেই শাড়ি পরতে পারি। ওরা নিশ্চই অনেক মজা করছে! শাড়িটা খুব পরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমি আবার একা একা শাড়ি পরতে পারি না। এখন এই অসময় শাড়ি পরার কথা বললে মা নিশ্চয় ক্ষেপে যাবেন। অগত্যা সালোয়ার-কামিজটা পরলাম— গত ঈদে ভাইয়া কিনে দিয়েছিল। ম্যাচিং করে টিপ, কানের দুল, লিপস্টিক সবই পরলাম। ওরা আজ কেমন সেজেছে কে জানে! আবারো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আজ স্কুল বন্ধ— সাপ্তাহিক ছুটি। মাঠে কয়েকটি ছাগল জিরিয়ে নিচ্ছে এই অলস দুপুরে।

রুমে এসে টেলিভিশনটা ছেড়ে দিলাম। চ্যানেলগুলো শেষ অব্দি ঘুরে এলাম। বিশেষ কিছু হচ্ছে না। *দ্যা টারমিনাল* মুভিটার শেষ দৃশ্যটা আবারো দেখলাম। মা কাজে ব্যস্ত। আমাকে এই ভাবে সেজে-গুজে টিভি দেখতে দেখলে নিশ্চয় খুব রাগ করবেন। টিভি বন্ধ করে হুমায়ূন আহমেদের *আজ হিমুর বিয়ে* বইটা হাতে নিলাম। গতকালই বইটা শেষ করেছি। কিছু কিছু জায়গা আবারও পড়লাম। হুমায়ূন আহমেদ যদি প্রতি সপ্তায় সপ্তায় বই বের করতেন তাহলে বেশ হতো! আমার না মাঝে মাঝে হিমু হতে ইচ্ছে করে! মেয়েরা কি হিমু হতে পারে? আমাদের এই সমাজে রাতে হিমুর বয়সী একটা মেয়ে হিমু হয়ে যদি হেঁটে বেড়ায় তাহলে তার কী কী ক্ষতি হবে ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। মেয়েরা শিশুদের মতো ঘরেই নিরাপদ। এসব ভাবনা মাথায় এলেই আমার আর হিমু হওয়া হয় না।

আবারও বারান্দায় গেলাম। এখন নতুন পোশাকগুলো ছেড়ে সাদা-কালো মিক্সড সুতি কাপড়ের একটি স্যালোয়ার পরে আছি। কিছু দূরে একটি একটি ল্যাংড়া ফকিরকে চাকাওয়ালা গাড়িতে করে ওর বৌ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফকিরটা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর বোধহয় আমার বয়সী মেয়ে আছে; আমাকে দেখে তার কথা ভাবছে, কিন্তু দৃষ্টি বলছে অন্য কথা। আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠল।

বিয়ের পরে :

আজ আর ঘুম আসল না কিছুতেই। জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। আলোকচ্ছটা সামনের উঁচু দালানটির ফাঁক গলিয়ে আমার কপালে এসে পড়ল।

আলো আমার ভালোলাগে না কিন্তু রোদ আমার বেশ লাগে। দাঁড়িয়ে রইলাম ঠাঁয়। আমার রুমটা পশ্চিমে হওয়ায় দুপুরের রোদে বেশ তেতে ওঠে। আমার আবার গরম সহ্য হয় না। এ কারণে দুপুরে ঘুমাতে বেশ কষ্ট হত। মি. শাফিন আহমেদ আমার হাসব্যান্ড। বেশ মোটা বেতনের চাকুরি করে। প্রতিবেশীরা এ জন্য আমাকে বেশ সমীহ করে। গত এক বছর থেকে ওর পিছনে লেগে থেকে রুমে এসি লাগিয়ে নিয়েছি। প্রথম প্রথম এসির ঠাণ্ডা সহ্য হত না। এখন সয়ে গেছে, এই নতুন জীবনটার মতন। পর্দা সরিয়ে দিলাম, কপাল তেতে গেছে। এসি থাকলে এই এক অসুবিধে— রুমের বাতাসকে আবদ্ধ রাখতে হয়। আচ্ছা বাতাস, তোর মন খারাপ হয়? নাকি তোরো সয়ে গেছে? ও মানে আমার হাসব্যান্ড এখন অফিসে। কাজ পাগল মানুষ। ছুটির দিনেও গাদাগাদা কাজ নিয়ে বসে যায়। আমরা শেষ কবে একসাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, ঠিক মনে পড়ছে না, — তবে এটুকু মনে আছে, ঐ সময় শীতকাল ছিল। বাইরে প্রচণ্ড হিম বাতাস বইছিল। আমি মেরুন শাড়ির উপর কালো রঙের চাদরটা পেঁচিয়ে রেখেছিলাম, ও পরেছিল সাদা সার্টের হালকা অ্যাস কালারের উপর কাশ্মিরী সোয়েটার। দিনটি ছিল শুক্রবার। আমরা বোধহয় ওর কলিগের বাচ্চার জন্মদিনে গিয়েছিলাম;— এর বেশি কিছু মনে নেই। গত ঈদে আমার তপন ভাইয়ের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল, বাবা যেদিন মারা গেলেন— ঐ শেষ যাওয়া। মা কেমন আছেন কে জানে ! গেল সপ্তায়, তপন ভাইয়ের মেয়ে হয়েছে, আমার মতন নাকি দেখতে!

রিমোর্টটা হাতে নিলাম। এখন পরিচিত কোনো সিরিয়াল নেই। যেগুলো হয় পুনঃপ্রচারিত, রাতেই দেখা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তাও দেখি। ওদের কী হবে আগে থেকেই বলে দিই,— ভবিষ্যৎকে যদি এমন করে দেখতে পেতাম, মাঝে মাঝে খুব লোভ হয়! আজ শনিবার। এই দিনে তেমন কিছু হয় না। আমির খানের অনেক পুরানো একটা সিনেমা খুলে বসে থাকি। সিনেমাটি যে কতবার দেখেছি তার ইয়াত্তা নেই। আমার যদি ভুলে যাওয়ার কঠিন কোনো রোগ থাকতো, তাহলে টিভি দেখেই দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারতাম কয়েকটি জীবন। ঘণ্টাখানেক টিভির সামনে ঠাঁয় বসে রইলাম। ৭৭টি চ্যানেল আছে, সবগুলো কয়েকবার পাক মেরে এসেছি। রিমোটের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে তাই ঝুঝি এক চাপে কাজ হচ্ছে না। বিদ্যুৎ চলে গেল। দুপুর দু'টা, এই সময় একবার যাবেই। এ মাসের *সানন্দা*টা নিয়ে বাইরের রুমের সোফায় গিয়ে বসলাম। এই সংখ্যায় রূপচর্চার ওপর ভালো একটা আর্টিকেল আছে, গতকাল ট্রাই করেছিলাম। এবং মেয়েদের ব্যায়াম নিয়ে দীর্ঘ এক ফিচার আছে। আমার ঠিক কাজে লাগবে না তবুও পড়লাম। বাংলাদেশের মেয়েরা নাকি বসে থেকে থেকে মুটিয়ে যাচ্ছে। আমার স্বামীর আবার স্বাস্থ্যবান মেয়ে পছন্দ সুতরাং আমার শরীরে আরেকটু মাংস লাগলে মন্দ হবে না, সে বরং খুশিই হবে। বাচ্চা হওয়ার পর মেয়েদের স্বাস্থ্য

নাকি ঢিলে হয়ে যায়, আমার ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। *সানন্দায়* কারিনার স্বল্প কাপড়ে বেশ বড়সড় একটা ছবি প্রিন্ট করা হয়েছে, বাঙালি মেয়েদের ব্যামের সুফল বোঝানোর জন্য এই আয়োজন। এতে করে অবশ্য পুরুষ মহলেও সানন্দার কদর বাড়বে। পুরুষদের কিত্তির কথা ভাবলে মাঝে মাঝে আমার খুব হাসি পায়, আবার করুণাও হয়। *সানন্দা*টা বেশ কয়েকবার উল্টে-পাল্টে দেখলাম, পড়তে আর কিছুই বাকি নেই। প্রতি মাসে তিনটে করে বেরুলে বেশ হত। ওটা টেবিলের উপর রেখে বারান্দায় চলে আসলাম। যখন তখন বারান্দায় আসাতে স্বামীর বারণ আছে, এ কারণে কেন যেন বারান্দায় আসাটা বেশি হয়ে যায় ইদানিং। এ বাসাতে একটিই বারান্দা। যতদূর চোখ যায় বিল্ডিং আর বিল্ডিং— উঁচু-নিচু, চ্যাপ্টা-সরু, নতুন-পুরানো, ঝকঝকে-ধূসর বিল্ডিং। আমাদের বিল্ডিং এর এই পার্শে ছোট্ট একটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। এই জায়গাটি বেশ নোংরা। আশেপাশের বিল্ডিংগুলোর যতসব আবর্জনা এখানে এসে আবাস গড়ে,— খুব বাজে একটা গন্ধ বেরোয় ওদের শরীর থেকে। আমি এই পাঁচতলা থেকেও দিব্যি টের পাই ওদের অবস্থান। জায়গাটির এক কোনায় খুব স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি গাছ, গাছটির নাম জানা হয়নি আজও। আমার স্বামীকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি। ও আবার উদ্ভিদবিদ্যায় খুব কাঁচা। বাড়ির কাজের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও বলেছে পাতা না দেখে বলতে পারবে না। সমস্যা হল, গাছটিতে পাতা গজাতে দেখেনি কখনও। আচ্ছা, ও বেঁচে আছে তো? অনেক আগে একবার রাস্তায় একটি কুকুর দেখেছিলাম। শরীরে কে বা কারা যেন গরম পানি ঢেলে দিয়েছিল, ফলত শরীরে কোথাও কোনো লোম ছিল না। আমি দেখেই বমি করে ফেলেছিলাম। গাছটিকে দেখলে আমার ঐ কুকুরের কথা মনে হয়। এখন আর বমি পায় না আমার, খুব করুণা হয় গাছটির জন্য। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন গাছটির সাথে মিশে যাচ্ছি ক্রমশঃ। বারান্দায় বসে থেকে আমি গাছটিকে দেখি— ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। বজ্জাত কাকের দল সব ময়লা আবর্জনা ঘেটে ঘেটে গাছটিতে চেপে বসে। আমি অনেক বারণ করেছি, ধমকও দিয়েছি, কাজ হয়নি। শূন্য গাছটির শরীর জুড়ে যখন ক্ষুধার্ত কাকের দল হা করে ঠিকরে তাকায় আমার দিকে। ভয়ে জড়সড় হয়ে যায় আমি। তড়িঘড়ি করে কপাট লাগাই দরজার : পণ করি, বারান্দায় আর নয়। গাছটির মায়ায় এ পণ বেশিক্ষণ টেকে না। আজ কাকগুলো কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। আমি অনেকক্ষণ গাছটির সাথে কথা বললাম। হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে চমকে উঠি। কে যেন গেটে,— কে আর হবে এই ভরদুপুরে,—আকলির মা থাকাতে আমার ভালোই হয়েছে। গেট খুলতে না খুলতে শুরু হয়ে গেল ওর বকর বকর।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে আরও একবার বসলাম। চুলগুলো আচড়ানো শেষ করে নতুন টিপগুলোর কয়েকটি ট্রায়াল দিলাম। গত সপ্তাহে ও আমার জন্য দুটো

ড্রেস কিনে এনেছে। ওখান থেকে কালো রঙেরটা বের করলাম। ড্রেস কেনার পর আর বাইরে যাওয়া হয়নি। রুমেই যে কয়েকবার পরেছি। এখন কালো রঙেরটা পরে দেখি, হুঁম, না থাক, একবারে গোসল করে পরব। টিভিটা আবার ছাড়লাম। গতরাতে দেখা সিরিয়ালটা আবার দেখলাম। তিনটা বাজতে আর বেশি বাকি নেই। আজ ও লাঞ্চ নিয়ে অফিসে গেছে। এখন গোসল করার দরকার। টিভি অফ করে গোসলে গেলাম।

গোসল সেরে আবারও ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসলাম। অনেকক্ষণ। আমার আয়নার সামনে বসতে মোটেও ভালো লাগে না, তবুও বসে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আয়নার ভেতর আমি আমার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পাই। টেবিল থেকে *রবিনসন ক্রুসো* বইটা নিয়ে বারান্দায় গেলাম।

যখন আগ-পিছ বলে কিছু নেই :

পাশের বাসায় যেতে খুব ইচ্ছে করছে। ঐ বাসায় গেলে আরজু আবার খুব রাগ করে। আরজু আমার একমাত্র ছেলে। আরজুর এক ছেলে। আরজুর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ওর ছেলেটা নিয়েই যেটুকু ব্যস্ত থাকি। বৌমা ব্যাংকে চাকরি করে। ওরা দু'জনে বেশ ভোরে বের হয়ে যায়, বাড়ি ফেরে পড়ন্ত বিকেলে, মাঝে মাঝে সন্ধ্যাও হয়ে যায়। রামিম মানে আরজুর ছেলেও বেশ ব্যস্ত। সেই সকালে স্কুলে যায়, বাসায় ফেরে দুপুরে, তারপর শুরু হয় হোম টিউটরদের আসা— কেউ অংক শেখায়, কেউ ইংরেজি, কেউ ছবি আঁকা, কেউ গান, কেউবা আবৃত্তি— কোনো কোনো দিন রাত অব্দি চলে যায়। আমাকে কোনোকিছুই করতে হয় না।

এ বাড়িতে আবার কোনো বারান্দা নেই। পাশের বাড়ি যাব সেটাও বারণ। আরজুকে কত করে বললাম, বাড়িটা চেঞ্জ করে বারান্দা আছে এমন বাড়ি নিতে। আরজু কিছুই বলে নি। আরজু অনেক ব্যস্ত, ঠিক যেমনটি আমার বাবা ছিল, যেমনটি ছিল ওর বাবা। আমার বারান্দা নিয়ে ভাবার সময় ওর নেই।

আমি কী চাই, আমার ভেতরটা কী বলে ওরা কোনোদিনই জানতে চায়নি— না আমার বাবা, না আরজুর বাবা, না আরজু। একদিন আমি নদী হতে চেয়েছিলাম, কাশফুলের বনে দেহ এলিয়ে ভেসে থাকতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম নগ্নপায়ে শিশিরস্নপাত ক্ষেতের আইল ধরে এক সভ্যতা থেকে আরেক সভ্যতা ঘুরে বেড়াতে। আমি ব্যস্ত থাকতে চেয়েছিলাম। আমিও ওদের মতো সমাজের কেউ হতে চেয়েছিলাম। এক সময় ছিলাম হেলাল সাহেবের মেয়ে, পরে হলাম— তপনের বোন, শাফিনের বউ, আরজুর মা; আর এখন, রামিমের দাদি। শুধু পরিচয় বদলেছে থেকে থেকে, এছাড়া আর খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি আমার; — ভালো ছিলাম, ভালোই আছি!

প্রকাশ : *নতুনদেশ, বাংলামাটি*

মৃত্যু মৃত্যু খেলা ও একটি গল্প

ক

"একটা গল্প বলো তো! সুন্দর সাজানো গোছানো একটা গল্প, যে গল্প শুনে সকলে জীবনকে স্বীকার করবে অকপটে।" নাজমার এই আবেদনে অপারগতা প্রকাশ করে আসিফ।

"না নাজমা, আমি পারবো না। যেখানে মানুষ মরছে অকাতরে, অকারণে ছুটছে সবাই, বৃষ্টির মতো গলে পড়ছে সম্পর্ক, সেখানে আর যাই হোক সুন্দর কোনো গল্প বলা যায় না।"

নাজমা আসিফের কথার অনেকটাই বোঝে না, তবুও ভালো লাগে আসিফকে। আসিফের চোখ দিয়ে সে দেখে নেয় তার অন্ধকার জগতের চারপাশ। নাজমা হুইল চেয়ারের চাকা কয়েক পা গড়িয়ে ছাদের কিনারে এসে থেমে যায়।

"থামলে কেন? আরো কয়েক পাক খেলেই পারতে!"

"হুঁম্, সোজা নিচে, তারপর ধপাশ্!"

"তারপর মুক্তি! এই পাক খাওয়া জীবন থেকে চিরন্তন মুক্তি।"

আসিফের কথায় মুচকি হাসে নাজমা, এতেই গালে টোল পড়ে যায় খানিকটা।

"হুঁম্, বলেছে তোমাকে? এইভাবে মুক্তি নেয়াকে বলা হয় আত্মহত্যা। আর আত্মহত্যা যারা করে তাদের কখনোই মুক্তি মেলে না, কারণ আত্মহত্যা হচ্ছে মহাপাপ!"

"মহাপাপ!" হো হো করে হেসে ওঠে আসিফ। যান্ত্রিক হাসি। এই হাসিতে কোনো স্বাদ খুঁজে পায় না নাজমা। "নাজমা, এই পৃথিবীর বিভৎস রূপ তুমি দেখোনি, আমি দেখেছি— কত শত অন্যায় অবিচার ঘটে চলেছে এই পৃথিবীর বুকে! তোমার সৃষ্টিকর্তা বোধহয় তোমার মতোই চার দেয়ালে বন্দি করে রেখেছে নিজেকে আর স্বপ্ন দেখছে : দলে দলে পৃথিবীর সব জীব তাঁকে কুর্নিশ করছে, না

খেতে পাওয়া শরীর, বিকৃত দেহ— সব গেছে তাঁকে সাধুবাদ জানাতে। দেখবে নাজমা, একদিন সত্য প্রকাশ পাবেই, কঠিন সে সত্য। আমার মতো অনেকেই এখন সেই পথের সন্ধান করছে। ঐ পথ ধরে আবিষ্কার করা হবে সৃষ্টিকর্তার আসল রূপ, বন্ধ হবে এই মৃত্যু মৃত্যু খেলা।"

"আমি জানি, তুমি মৃত্যু দেখেছো খুব কাছে থেকে। আমি হয়ত দেখিনি তবে অনুভব করেছি— আমার অন্ধকার চোখ দিয়ে অন্ধকার মৃত্যুকে : চারিদিকে প্রচণ্ড অন্ধকার, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই আঁৎকে উঠি। শত হাতড়েও হাতে পাই না হুইল চেয়ারের ডানা। আসিফ! আসিফ!"

এমনি করে আসিফ নাজমার জগতে এই আসে, এই যায়। নাজমা আসিফের চোখ দিয়ে প্রাচীরের ওপারের জগতকে দেখে নেয়। জেনে নেয়, বাইরের জগতের প্রাণীদের সম্পর্কে, যাদের নাজমার মতোই দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ আছে। যারা আকাশের নীল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, সমুদ্রে এঁকে দেয় সীমানা, প্রতিনিয়ত ছুঁটতে থাকে অস্ত্র হাতে অস্ত্র কাড়তে। নাজমা পারে না ওদের সাথে পাল্লা দিয়ে সভ্যতা গড়তে ফলে পার্থক্য থেকে যায়— নাজমা বিশ্বাস ভাঙতে পারে না বলেই স্বপ্ন গড়তে পারে। সাদা সাদা বরফের দেশের স্বপ্ন। হাতের উপর হাত হেঁটে যায় সেখানে। খুবই সহজ আর সরল সবকিছু। অন্যদিকে স্বপ্ন দেখতে না পেরে ডানা ঝাপটায় আসিফ। পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চষে বেড়ায় সে। নদীর তটে, বটের তলে বসে থাকে অকারণ। যুদ্ধময়দানের মতো সেখানেও খাঁ খাঁ করে তার ভেতর। ফিরে আসে নাজমার কাছে, নাজমার হুইল চেয়ার স্পর্শ করে ছুঁতে চেষ্টা করে তার অনুভূতিকে।

খ

"দরজা খোলো—"

"বাইরের দিকে টান দাও—"

"খুলছে না তো—"

"তাহলে দেয়াল টপকে এসো—"

"চা খাবে?—"

"না—"

"এত অস্থির হচ্ছ কেনো?—"

"নাজমা, তুমি এ চার দেয়ালকে যত সহজে মেনে নিতে পারো, আমি তত সহজে পারি না। প্রতিনিয়ত ধর্মের নামে ঘটে যাচ্ছে অসংখ্য অনিয়ম। সৃষ্টিকর্তার নাম দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে বৈষম্য। একদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে র‍্যাপিং করা হচ্ছে নষ্ট সভ্যতাকে অন্যদিকে এক টুকরো রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি। একদিকে মধ্যরাতে মদ্য পান করে যুদ্ধবিরতি উপভোগ করছে মানবতারক্ষী কর্মীরা

অন্যদিকে একমুঠো ভাতের জন্য ভালোবাসা বিক্রি করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমি দেখেছি, শিশু আর বৃদ্ধদের মতন যুবকরাও কতটা অসহায়! না নাজমা না, এভাবে চলতে দেওয়া যায় না।"

আসিফের সাথে পাল্লা দিয়ে বলতে পারে না নাজমা— নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হয় তার।

"কী করবো আমরা? সৃষ্টিকর্তাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ঝাপ দেবো ছাদ থেকে?"

"তাহলে সব থেকে বেশি মজাটাই পাবেন সৃষ্টিকর্তা। বরং চলো মেরে ফেলি ওদেরকে যারা সৃষ্টিকর্তার দুয়ারে মাথা ঠুকে চলেছে প্রতিনিয়ত। ওরা মরলে সৃষ্টিকর্তার নাম ভাঙানো বন্ধ হবে। বন্ধ হবে নিগৃহীতদের নিগ্রহণ।"

নাজমা বোঝে না এসব মৃত্যু মৃত্যু খেলা। তার কল্পনার মানচিত্রে শুধুই বাঁচতে শেখা।

"বিকল্প কোনো পথ কি খুঁজে পাওয়া যায় না, আসিফ?"

"নাজমা, তুমি দেখোনি, আমি দেখেছি, চারিদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু। বিভৎস, কুৎসিত মৃত্যু— হাজারো রকমের মৃত্যু। একদিন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই শেষ হবে এই মৃত্যু মৃত্যু খেলার, তুমি দেখে নিও।"

"কিন্তু আমার স্বপ্ন! আমার স্বপ্নেরও কি মৃত্যু হবে, আসিফ? সাদা বরফের তৈরি মানুষ চারপাশে, জানতে চায় পথ ভুলে গেছি কি না। কোনো অসহায় নেই, নেই কোনো দরিদ্র। খুন, ধর্ষণ, মিটিং, মিছিল, ক্ষমতা এসব শব্দের কোনো স্থান নেই ওদের অভিধানে। জানো, ওরা না আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে— ওদেরও কি মৃত্যু চাও আসিফ? আসিফ! আসিফ!"

গ.

"জানো নাজমা, আজ না...!"

"কী হল থামলে কেন? কোনো পরিবারের সকলকে খুন করা হয়েছে নিশ্চয়? নাকি তোমাদের মিছিলে বৃষ্টির মতো গুলি বর্ষণ করা হয়েছে?

"এগুলো তো দৈনিক কাগজগুলোর বিষয়। আজ সকালে এক ভ্যানে আমরা চারজন মেডিক্যালের দিকে যাচ্ছিলাম; ভ্যান চালাচ্ছিল বারো কি চোদ্দ বছরের একটি ছেলে— শুধুই হাড়গুলো টিকে আছে। তুমি কান পাতলেই শুনতে পেতে হাড়ের ঠক ঠক শব্দ। ভ্যানের গতি ক্রমশঃ কমে যেতে দেখে আমার পাশের 'ভদ্রলোকটি' চেঁচিয়ে বললেন,

"এই ব্যাটা, চালা জলদি।"

"পারছি না স্যার!"— সেকি করুণ আবেদন।

"তাহলে চালাস কেন?"

"জানি না! অত রাগ হলে দিন না উপরে পাঠিয়ে। কত লোককে তো পাঠান। দিন না পাঠিয়ে। তাইলে মরেও বাঁচুম।"

"নাজমা, তুমি শোনোনি, আমি শুনেছি— বাঁচার জন্য সেকি করুণ আকুতি। মরার মাঝে বাঁচা। একটা যুবক, জীবনের সে কিছুই দেখেনি, মরতে চায় কারণ সে বাঁচতে চায়!"

আসিফ শক্ত করে ধরে নাজমার বাম হাতটা। নাজমা অনুভব করে আসিফ কাঁপছে, প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপছে আসিফ।

"আসিফ, আমি তোমাকে বরফের দেশে নিয়ে যাবো, যাবে তুমি? প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আমি প্রায়ই যাই।"

"আমি মৃত্যুর দেশে যেতে চাই, নিয়ে যাবে তুমি?"

আসিফের কথায় অপারগতা স্বীকার করে নাজমা।

"না আসিফ, আমি পারবো না। ইচ্ছে হলে তুমি একাই যাও— সৃষ্টিকর্তা আমার মতো করে গল্প শোনাবে তোমাকে, সাদা সাদা মানুষ...আরো কত কী!"

হেসে ওঠে আসিফ, মটরের মতো গোঁ গোঁ শব্দে। নাজমা কানে হাত চেপে ধরে।

"যে সৃষ্টিকর্তা কোনো শিশুর মুখ দেখেন নি, যে সৃষ্টিকর্তা কোনো মায়ের গর্ভ হতে জন্ম নেন নি, পাখিদের ডাক শুনে যাঁর ঘুম ভাঙ্গে না, সে আসবে আমাকে গল্প শোনাতে? হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

"মৃত্যুর পর সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আসবেন, তিনি আমাদের সকলের কাছে আসবেন, তুমি দেখো।"

"হয়ত আসবেন কারণ তখন আর আমরা অসহায় থাকবো না, আর কোনো অভাব থাকবে না আমাদের। সৃষ্টিকর্তাও নিশ্চয় দারিদ্রকে ভয় পান? আমাদের যখন আর কোনো অনুভূতি থাকবে না তখন তিনি আসবেন গল্প শোনাতে— ঠাণ্ডা বরফের দেশের গল্প!"

"ওহ! বরফের দেশের গল্পটা না অসম্ভব সুন্দর! তোমাকে তো বলাই হল না সবটা— শ্বেত ভালুকের মতো পোশাক সকলের; প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অথচ কী শান্তিটাই না পাচ্ছিলাম আমরা! তুমি যাওনি, আমি গিয়েছিলাম, সে এক অন্য রকম অনুভূতি। আসিফ! আসিফ!"

ঘ.

"নাজমা নাজমা—"

"খোলা আছে। চলে এসো।" খুব কষ্ট করে ভেতরে আসে আসিফ।

"না নাজমা, ওরা আর আমাকে বাঁচতে দিল না। তবে...!"

"কী বলছ আসিফ? কী হয়েছে তোমার?" আসিফের রক্তাক্ত বুকে হাত রাখে

নাজমা।

"তবে মুক্তির পথের সন্ধান আমি পেয়ে গেছি। সব মিথ্যা এতদিন যা গভীর সত্য বলে জেনেছি। আমি চললাম, শূন্যে : মুক্তির পথে।" নাজমা হুইল চেয়ারের হাতলটি শক্ত করে ধরে।

"কিন্তু আমার গল্পের যে এখনো অনেকটা বাকি...! বরফের দেশে হাঁটছি আমরা। কারও পায়ে স্কেটিং নেই অথচ আমরা হাঁটছি ঝড়ের গতিতে। কেউ কেউ মেঘ ছুঁয়ে আসছে এক এক লাফে, বিশ্বাস করো আসিফ। আসিফ! আসিফ! আসিফ!"

প্রকাশ : *নতুনদেশ, সবুজ অঙ্গণ*

উড়ে যায় সাদা শকুন

আমি জন্ম নিলাম রাজপ্রাসাদে—
পরিত্যক্ত ঘোড়ার ঘরে।
প্রাসাদের সমবয়সীরা ছিল উদ্দাম
ফেরেস্তাদের মতো সুন্দর কিন্তু আমি কুঁতকুঁতে কালো
যেন স্রষ্টার আশীর্বাদবঞ্চিত।

আমি গাইতাম ওদের থেকেও ভক্তি দিয়ে
অথচ পড়তো না হাতে হাত, বাজতো না বীণ
রাস্তার ছেলেরা বলতো, "নর্দমার কীট"
অথচ আমার জন্ম রাজপ্রাসাদে—
অসংখ্য তারকা খচিত কক্ষের মাঝে—
পরিত্যক্ত ঘোড়ার ঘরে!
যেন স্রষ্টার আশীর্বাদবঞ্চিত।

আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর দেশে ফিরছি। বিমানের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বেশ স্বস্তির সাথেই বসে আছি। প্রথম শ্রেণীতে আসীন হবার সামর্থ্য থাকলেও ইচ্ছে হয়নি, নিম্নবিত্তের মানিয়ে নেওয়া এখনো মেনে চলছি আমি। মানিকতলার সেই বাঁশবাগানের নিচে একটি কুঁড়ে ঘর, স্যাঁতসেঁতে কলের পাড়, বাড়ির সামনের পঁচা নর্দমায় একটি মাছের জন্য কেটেছে অনেকগুলো অলস দুপুর। মানিকতলার '১৪ বছর' আমার জীবনে এতই সত্য হয়ে উঠেছিল যে, দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমেরিকার প্রগতিশীল যান্ত্রিক জীবনে থেকেও মুখ ফেরাতে পারিনি মানিকতলার সেই তীব্র হাহাকার থেকে। আমার ১৪ বছরের না খেতে পাওয়ার ক্ষুধা আর মিটবে না বোধ হয়; বেঁচে থাকার তীব্র জিজ্ঞাসা এখনো থেকে গেছে মনের গহীনে। শান্তি আছে অথচ স্বস্তি পাইনি কখনো; শান্তি তখনও ছিল বাঁশবাগানের ঠাণ্ডা বাতাসে অস্থিসার দেহের ভার এলিয়ে, মায়ের পরম শাসনে, শিশিরস্নাত দূর্বা ঘাসের আইল ধরে

অজানার পথে ভেসে বেড়ানোতে, নর্দমার কাদাপানিতে শরীর ঠাণ্ডা করার ব্যর্থ প্রয়াসে। কিন্তু স্বস্তি পাইনি কখনো, না সেদিন বটবৃক্ষে চেপে, না আজ বিমানের তৃতীয় শ্রেণীতে চড়ে!

খ.

অনেকদিন পর দেশে ফিরছে স্বপন;— একটু আবেগে আপ্লুত হবার কথা, একটু অন্যরকম ভালোলাগার কথা কিন্তু সে শীতল হয়ে বসে আছে, ভাবলেশহীন ভাবে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, শুধু একটি নির্দিষ্ট বিরতি নিয়ে কেঁপে উঠছে চোখের পাতা, এটা দেখেই বিমানবালা বুঝে নিচ্ছে কোনো লোকসান ঘটেনি এখনো।

গ.

মার সাথে খুব বেশি সখ্য ছিল না আমার। অভাবের সংসার, তার ওপর আমার ভবঘুরে বাবার মায়ের গর্ভে ঘনঘন বীজবপণ। সংসারের দৈঘ্য বেড়েছে প্রতি বছরে, বেড়েছে খাবারের সংকট। আমি তাদের দশম সন্তান। ১১ তম মারা গিয়েছিল জন্মের তিন দিন পরে। দীর্ঘ ১০ মাস পেটে থেকেও পুষ্ট হতে পারে নি সে। তারপর ১২ তম সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে দুজনেই গেল। মা যতদিন বেঁচে ছিল জন্ম দিয়েছিল পাতি ছাগলের মতো যত্রতত্র যেখানে সেখানে। ছাগল হলে অনেক বাজার দর হত মার যেটা সে মানুষ হয়েও পায়নি কখনো। সারাদিন অন্যের বাড়িতে কাজ করে আমাদের অন্ন জোগানো, সন্ধ্যায় বাঁশের পাতা কুড়িয়ে রান্নার ব্যবস্থা করা, মধ্যরাতে 'এক স্তন ধরে শিশুর কান্না অন্য স্তনে বাবার শক্তির পরীক্ষা'। এই একটি জায়গায় লোকটি হারেনি জীবনে। ব্যতিক্রম না ঘটলে মানুষ পাঁচ বছর পর্যন্ত স্তন্যজীবী প্রাণী থাকে, আমার বাবা ছিলেন সারাজীবন।

বাড়ি বলতে আমাদের যা ছিল তা হলো দুই খোপযুক্ত একটি কবুতরের খাঁচা। তারই মধ্যে দশ দশটি 'প্রাণ,' প্রাণ না বলে 'দেহ' বলাই ভালো। আশে পাশে জায়গার অভাব ছিল না যদিও তবুও স্বপন সাহেবের বাবার এই দয়াটুকুই ছিল আমাদের জন্য উপচে পড়া যার ঋণ আমার বাবা-মা না পারলেও অনেকখানি পুশিয়ে দিয়েছিলো আমার বোনেরা। আমি প্রবাস জীবনে বহুবার প্যাডের পৃষ্ঠার মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি বিন্দু বসিয়ে এঁকেছি আমার বাড়ির মানচিত্র। এতকথা যে জন্য বলছি— এক ঘরে আমি, বাবা, মা সঙ্গে আরো দু'ভাই-বোন থাকতাম। মাঝে মধ্যে মধ্যরাতে মাকে লাথি মেরে উঠে যেত বাবা তবে বেশির ভাগ সময় মা করতো সমঝোতা। বৈবাহিক সম্পর্কে ভালোবাসা না থাকলেও চলে। প্রাচীন শাস্ত্রে আছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্যা" অর্থাৎ পুত্র জন্ম দেওয়ার জন্য বৌ আনা।

আধুনিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শয্যাক্ষেত্র, তাই তোমরা তোমাদের শয্যাক্ষেত্রে যেভাবে খুশি প্রবেশ করতে পারো"। আসলে সব রসুনের এক পুটকি। তা না হলে খাল কেটে কুমির আনবে কে! তাছাড়া পতিদেব না সাজলে তাদের অত্যাচারের যে ধরন তাতে করে প্রতিরাতে মেয়েদের লাথি খেতে হত। পুরুষদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে তারা তাদের আদলেই পেয়েছে। তাছাড়া, বিজ্ঞান বলে সন্তান জন্ম দিতে ভালোবাসা লাগে না। 'ধর্ষণ করলে কি গর্ভ হয় না?' আসলে আমরা এক একজন ছিলাম এক একটি ধর্ষণের চূড়ান্ত পরিণাম। আমার মেজো বোন দেহের ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে সর্দার চাচার (স্বপন সাহেবের বাবা) সাথে ধরা পড়লো; গ্রাম শুদ্ধ লোক তার বিচার করলো অথচ আমার মাকে প্রতি রাতে বলপূর্বক ধর্ষণ করেও বিচার হয়নি আমার পিতৃদেবের। বাংলাদেশে শতভাগ মেয়েই ধর্ষণের শিকার হয় এবং তা বিবাহ নামক ধর্মসিদ্ধ অতি পুণ্যকর্মটি সম্পাদন করার পরেই, এ জন্যই কোনো বিচার হয় না। ফলত জন্ম হয় আমাদের মতো এক একটি অসুস্থ্য সত্তার। তিনবার কবুল বলা অথবা আগুনকে কেন্দ্র করে সপ্তপাকে চক্কর দেওয়ার সময়টুকুকে যদি পরবর্তী দশ, বিশ অথবা পঞ্চাশ বছরের জীবন থেকে বড় করে না দেখা হয় তাহলে আমরা বাঙালিরা বেশিরভাগই এক একটি নির্মম ধর্ষণের পরিকল্পিত (!) ফসল। জন্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা গর্ভপাতের কথা উঠলেই আমার বাবা-মা ধর্মের কত শত অজুহাত এনে খাঁড়া করতো অথচ তাঁদেরকে আমি নামায পড়তে দেখিনি কোনোদিন। জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভপাত নাকি শিশুহত্যার শামিল আর শিশুহত্যা হচ্ছে মহাপাপ। তাই আমাদের জন্ম দিয়েছে হিড় হিড় করে, তারপর তিলে তিলে মেরেছে। আমরা জীবিত থেকেও মৃতের স্বাদ পেয়েছি প্রতিটা ক্ষণে। তবু খুশি হয়েছেন সৃষ্টিকর্তা তাঁর ভক্তকুলের অনাবশ্যক বিস্ফোরণ দেখে, স্বস্তি পেয়েছেন আমাদের পিতা-মাতা, কী stupid sentiment!

ঘ.

প্রায়ই মনে হয়, এইতো সেদিন! আমার ছোট বোন, তার বয়স তখন মাত্র বারো, সে যে বাড়িতে কাজ করতো সেই বাড়ির সদ্য লেখাপড়া শেষ করে ফেরা স্বপন সাহেব, আমি কত গর্ব করেছি যার নামে আমার নাম হওয়াতে, দশ টাকার লোভ দেখিয়ে আমার বোনকে নিয়ে গেলেন বিছানাতে, আমি দরজার এপাশে দশ টাকায় কী কী কিনতে পারি সেই হিসাবে পাগলপ্রায়। তারপর সে যখন ঘর থেকে বের হল : তার পায়জামা রক্তে ভিজে একাকার। ঐ রক্ত নিয়েই ছুটে গেছি আমরা গঞ্জের হাটে; রক্ত ঝরতে ঝরতে সাত দিনের মাথায় মারা গেল সে। ভাবতে ভালো লাগে, অনেক কিছুই 'মন ভরে' খেয়েছিলাম সেদিন। ভাইবোনের অভাব

আমার ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত এই অভাবটাই সব অভাবকে ছাড়িয়ে যায়। বড় দুই ভাই ডাকাত দলে নাম লেখানোর পাঁচ দিনের দিন মারা পড়লো। এক ভাই জেলে, আরেক ভাই এর ওর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখে শহরে চলে গেল, আর ফেরেনি কখনো। বড় বোনের 'পেটের ক্ষুধা আর দেহের ক্ষুধা' যেদিন একাকার হয়ে গেল, চলে গেল মালো পাড়ায়, বাবা-মা আর ঘরে তোলেনি তাকে। সমাজকে তারা বড় বেশি মান্য করতো যদিও সমাজপতিরা আমার বাবাকে 'মুচি' ছাড়া ডাকেনি, আমার মেজো বোনকে গর্ভধারণ করিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে; আমার তিন বোনের যেকোনো একটি যদি বেশ্যাবৃত্তি করতো আল্লাহর কসম আমাদের কোনো অভাব থাকতো না। সমাজপতিরা তাদের স্বার্থেই বাঁচিয়ে তুলতো আমাদের। আমরা যখন প্রতিটা ক্ষেত্রেই সমঝোতা করে চলেছি এক্ষেত্রে করলেই কী বা এমন ক্ষতি হতো! সমাজ-নীতির দোহাই দিয়েছেন আমার বাবা-মা। যে সন্তান বাঁচতে চেয়েছে তাকেই করেছেন ত্যাজ্য; অথচ আমার মা যখন মারা গেলেন, জানাযা হল না তাঁর, পুঁতে রাখা হল গর্তে। আমার বয়স তখন আট। বাবা আবার বিয়ে করলেন। সংসারের এত ঘাটতি সহ্য হলেও এই একটি জিনিসের ঘাটতি তিনি কিছুতেই মানতে পারলেন না। আমার আশ্রয় হল দাদির কাছে। আশি বছরের বৃদ্ধা, অভাবের সংসারে তার এই অনর্থক দীর্ঘজীবনের আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পেতাম না। মাঝে মধ্যে মনে হত বালিশ চাপা দিয়ে মেরে দিই বুড়িকে। না মেরে ফল অবশ্য ভালোই হয়েছে। ওই বুড়ির কারণে আরও চারটা বছর বাড়িতে ঠাঁই হয়েছিল আমার। দাদির মৃত্যুর পরপরই আমি মানিকতলা ছেড়েছি, ছেড়েছি আমার পরিচয়। আজ খুব দাদির কথা মনে পড়ছে। মানুষটা খুব কষ্ট পেয়েছেন জীবনে তবুও নিয়মের এদিক ওদিক হননি এক বিন্দুও। মাঝে মাঝে দাদার কথা বলে খুব কান্নাকাটি করতো। লোকটি নাকি 'অসম্ভব ভালো' ছিল, দাদিকে ভালোবাসতো প্রচণ্ড! আমার বাবা যখন পেটে, দাদির বয়স তখন তের, দাদির দেখাশোনা করার জন্য তার বিধবা বোনকে বাপের বাড়ি থেকে আনালেন, দশ দিনের দিন সকালে দাদা আর দাদির বোনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, খুঁজে পাওয়া যায়নি দাদির সারা জীবনের গোছানো সঞ্চয়, মাঝখান থেকে রেখে গেছে আমার বাবাকে, দাদির কাছে যা যক্ষের ধন হলেও প্রকৃতপক্ষে ছিল বড় রকমের যন্ত্রণা। দাদিকে খুব ভালোবাসতো দাদা— দাদি এই বিশ্বাস নিয়েই ৭১ বছর পার করে দিলেন অনায়াসে। মানুষ মাঝে মাঝে তার ঈশ্বরকেও ছাড়িয়ে যায়। দাদি তা পেরেছিলেন কিনা জানি না তবে দাদি যে দিন মারা গেলেন, আমি তাঁর পায়ে মাথা রেখে বলেছিলাম, যতদিন সত্যিকারের কারো সন্ধান না পাচ্ছি ততদিন তোমাকেই রেখে দিলাম। দাদি মারা যাওয়ার আগে পোলাও খেতে চেয়েছিলেন। মানুষ মারা যাওয়ার আগে পুনরায় শিশু হয়ে যায়, বড় আজব আজব

ইচ্ছা পোষণ করে তখন। আমার দাদি চেয়েছিলেন পোলাও খেতে, যা ছিল আমাদের সামর্থের শেষ সীমানায়, বাবা তাই এড়িয়ে গেছেন বিষয়টি। একদিন ভর দুপুরে দাদি স্বপন সাহেবদের রান্নাঘরের পিছনে বসে ছিলেন। আমিও ছিলাম। খুব অদ্ভুত একটা জিনিসের গন্ধ পাচ্ছিলাম আমরা। দাদি অনেকক্ষণ বসে ছিলেন তারপর বাড়িতে এসে পিঁড়িতে মাদুর পেতে শুলেন, আর ওঠেননি। অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম সেই গন্ধটি ছিল পোলাওয়ের। আজ ভাবতে ভালো লাগে জীবনের শেষ ইচ্ছেটার অন্তত খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন তিনি।

ঙ.

বিমানবালা স্বপনের দিকে টিস্যু পেপার এগিয়ে দেয়। স্বপন টের পায় না কিছুই। বাঙালিদের কাঁদতে হয় না, কান্না নিজ থেকেই আসে। প্রতিটা শিশু মায়ের পেটে থাকতেই এমন করে রপ্ত করে আসে এই কঠিন শিল্পটা যে ভবিষ্যতে এর থেকে সহজ আর কোনো কিছুই হয়ে ওঠে না। গরিবের সন্তানেরা ছোট থাকতে কারণে অকারণে এত বেশি কাঁদে যে পরবর্তীতে কান্নার প্রতি এক প্রকার বিতৃষ্ণা চলে আসে। তবে স্বপন খুব বেশি কাঁদেনি জীবনে, কাঁদতে পারলে অন্তত নিজেকে ভুলিয়ে রাখা যেতো। এখন একটু কাঁদবার চেষ্টা করে সে, তারপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

"কেমন আছিস খোকা?"

"মা, তোমাকে না কতবার বলেছি আমাকে খোকা বলবে না। আমার খুব ভালো একটা নাম আছে।"

"ও তাই তো! আমার মনে থাকে না বাবা। তা কেমন আছিস স্বপন?"

মানিকতলার কুঁড়ে ঘরের এক ছেলে, 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' এমন যাদের অবস্থা, এখন সে বিমানে বসে আয়েশ করে ঘুম পাড়ছে, তার কি খারাপ থাকা উচিৎ হবে?

"এভাবে বলছিস কেন বাবা? তুই কি তবে ভালো নেই?"

"আমার কথা বাদ দাও মা, তোমার কথা বলো।

আচ্ছা মা সৃষ্টিকর্তা কি সত্যিই আছেন?"

"ছিঃ বাবা, এভাবে বলতে হয় না, তিনি রাগ করবেন।"

"সৃষ্টিকর্তা রাগ করলে কি খুব বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে মা? মানিক তলার সেই স্বপন সাহেবদের তিনতলা সাদা ধবধবে বাড়ির পাশে এক পরিত্যক্ত ঘোড়ার ঘরে জন্ম হল আরেক স্বপনের। সৃষ্টিকর্তার আমাদের ওপর অনেক রাগ, তাই না মা?"

"এমনিতেই তিনি অনেক নরম, দয়ার অথই দরিয়া, তিনি তাঁর মমতাকে

একশভাগ করে মাত্র এক ভাগ তাঁর সকল সৃষ্টির মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রেগে গেলে তাঁর থেকে কঠিন বস্তু আর মিলবে না। তাঁর যে কথা শুনবে না তাকে দিবেন এমন শাস্তি যা আমাদের ধারণার বাইরে"।

"আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি যখন তখন। কই তুমি তো আমাকে একচুলও আঘাত করোনি। তাহলে এত দয়ার সাগর যিনি তিনি তাঁর সন্তানদের এত কঠিন শাস্তি দিবেন কেমন করে?"

"কার সাথে কার তুলনা! তাঁর শক্তি সীমাহীন, তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন।"

"শক্তি থাকলেই অনেক কিছু করা যায়, তাই না মা? এজন্য বাবা তোমার ওপর যখন যা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করেছে, বাবার ওপর করেছে স্বপন সাহেবরা, আর সবার ওপর সৃষ্টিকর্তা। আচ্ছা মা, সৃষ্টিকর্তা কি বাবার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী?"

"পাগল ছেলে আমার! তুলনারও তো যথার্থ উপলক্ষ থাকা চাই।"

"তাহলে তো তোমার কষ্টের পাল্লাটা এখন আরো ভারি?"

"তা তো একটু হবেই, পাপ করেছি শাস্তি হবে না!"

"তুমি আবার পাপ করার সময় পেলে কখন! যতদিন বেঁচে ছিলে গাধার মতো সংসার টেনেছো, ভার বয়েছো আমার বাবার গণ্ডারের মতো দেহের। উনি কেমন আছেন মা?"

"খুব ভালো আছেন। শুনেছি মৃত্যুর আগে খুব অসহায় একটা মেয়েকে বিয়ে করে "সামাজিক স্বীকৃতি" দিয়েছিলো। তাই সৃষ্টিকর্তা তাঁর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়ে জান্নাত বাসী করেছেন। তাঁর জন্য দোয়া করিস বাবা"।

"সৃষ্টিকর্তা 'সত্যি সত্যিই' খুব 'দয়ালু,' তাই না মা?"

"হুঁম্!"

টানা নিঃশ্বাস ছাড়ে মা। তারপর অনেকক্ষণ কেউ কথা বলে না।

"দাদি কেমন আছেন মা?"

বিমান বালার আলতো স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে যায় স্বপনের।

"স্যার আপনি ঘামছেন"।

তারপর স্বপনের দিকে টিস্যু পেপার এগিয়ে দেয়।

"আপনি ফ্রেস হয়ে নিন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশে অবতরণ করবো।"

এদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ না হয়ে পারে না স্বপন। সাধারণত বাসে যারা কাজ করে তাদেরকে বলা হয় 'হেলপার', ট্রেনে যাঁরা কাজ করে তাঁরা হল 'টিটি' আর বিমানে 'বিমানবালা'। পেশাটা একই অথচ হেলপারদের মানুষ বলে মনে

করা হয় না, টিটিরা মানুষের মতো, আর বিমানবালারা পরিপূর্ণ মানুষ। যানবাহনের সমাজে বিমান হচ্ছে 'মৌ— লোভী' গোছের তাই তো এখানে রাখা হয়েছে উচ্চ প্রজাতির সেবিকাদের। ভোগ করার ক্ষমতা যাদের আছে তাঁরা শুনবে কেন? হাসতে হাসতে বিমান থেকে নেমে পড়ে স্বপন। মাটিতে পা দিয়ে টানা নিঃশ্বাস নিয়ে মনে মনে বলে ওঠে, 'আমার মানিকতলা'।

চ.

'মানিকতলা' এখন আর 'মানিকতলা' নেই, হয়ে গেছে 'স্বপন নগর'। মানিক নামের এক ব্যক্তি, আজ থেকে শত শত বছর আগে, এই গ্রামের পত্তন ঘটায়, গ্রামটির নাম হয় 'মানিকতলা'। শহর থেকে, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে একটি লোকালয়, 'মানিকতলা', আজ নিজেই যেটি একটি পরিপূর্ণ শহর হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে সভ্যতার চারণক্ষেত্র, 'স্বপন নগর'। স্বপন সাহেবের দানবাকৃতির দুইটা ফ্যাক্টরি এখন এই গ্রামের ত্রাণকর্তা। 'ধন' থাকলে 'ধনের' চাহিদাও বেড়ে যায়। ভাবতে ভালো লাগছে আমার মানিকতলায় আর আমার মতো স্বপনের জন্ম হয়না। জন্ম হয় স্বপন সাহেবের।

ছ.

স্বপন অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো আপনজনদের সন্ধান পায় না, সন্ধান পায় না অস্তিত্বের। ত্রিশ বছরের মধ্যে একটা পরিবার বিলীন হয়ে যায় চিরতরে। স্বপনের কোনো পরিচয় থাকে না, থাকে না কোনো ঠিকানা।

এখন স্বপন সাহেবের গেস্টরুমে বসে আমি। বাইরের কেউ এই গ্রামে আসলে স্বপন সাহেবের বাড়িতে বিশেষ 'আদর আপ্যায়ন' পায়, আমি এখন বাইরের কেউ। স্বপন সাহেবের বাড়ির উত্তরে ভুতুড়ে এক বাঁশবাগান ছিল, যার নিচে ছিল আমাদের কুঁড়েঘর, সেখানে গড়ে উঠেছে *স্বপন ক্যাবলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ*। ইতিমধ্যে আমার সামনে বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি খাবার দেওয়া হয়েছে, ঘৃতান্নও আছে তার মধ্যে। এই স্বপন সাহেবের কাছে নানান ভাবে ঋণী আমরা। স্বপন সাহেবের বাবার কল্যাণে আমার মেজো বোন আত্মহত্যার একটি উপযুক্ত উপলক্ষ খাঁড়া করতে পেরেছিল, মরেই বেঁচেছিল বেচারি। ভাবতে ভালো লাগে মরবার আগে অন্তত 'দেহের ক্ষুধাটা' মিটেছিল তার। স্বপন সাহেবের বিশেষ কৃপায় সেদিন ঐ দশ টাকায় অনেক কিছুই খেয়েছিলাম আমরা, তাঁদের বদৌলতে আমার দাদির শেষ ইচ্ছাটা অনেকাংশে পূরণ হয়েছিল। খাওয়া শেষ করে চলে আসবার সময় স্বপন সাহেবের হাতে হাত মেলায় স্বপন যে হাতে

একদিন পিষ্ট হয়েছিল তার বোনের কাঁচি দেহ, টিকে থাকার পূর্বশর্ত এটাই। স্বপন শুধু বেঁচে থাকতে চায় না, টিকেও থাকতে চায়। মেইন গেটের বাইরে এসে পিছনে ফিরে তাকায় স্বপন, বড় বড় স্বর্ণাক্ষরে লেখা "হাজী স্বপন ভবন"। নিজের নামটা এভাবে দেখে গর্বে বুকের ভেতরটা 'হুঁ হুঁ' করে জ্বলে ওঠে। বামদিকে মায়ের বুকের ওপর গড়ে উঠেছে অতিকায় *স্বপন ক্যাবলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ*। মা'র মতো ক্ষুদ্র একটা মানুষের এত বড় সম্মাননা! আনন্দে অশ্রু এসে যায় স্বপনের।

প্রকাশ : *শাশ্বতিকী, মৃদঙ্গ, স্নান, স্বরে অ, দ্রোহ, সোনাঝুরি*

রাতুল পাল-এর গল্প

জাগরণ

গল্পটা শোনার পর বিস্মিত অন্তু প্রশ্ন করেছিল দাদুকে, "কিন্তু পাথর মানুষের মতো প্রাণ পায় কী করে ?"

একটু গম্ভীর হয়ে দাদু বলেছিল, "পায় রে দাদুভাই, পায়। মানুষ পাথর হতে পারলে, পাথর মানুষ হতে পারবে না কেন?..."

আজ অনেক দিন পর কৈশোরে দাদুর কাছে শোনা সেই গল্পটা মনে পড়ে অন্তুর, একটি নব্য স্বাধীন দেশের গল্প—

হাজারো মুক্তিকামী বীরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দেশটি পুনরুদ্ধার করেছিল তার স্বাধীনতা। মুক্তিলাভের পর বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন স্বরূপ দেশটি জুড়ে গড়ে তোলা হয় বহুসংখ্যক পাথরের মূর্তি। সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েই মুক্ত দেশের অধিবাসীরা শপথ নেয় তাদের স্বপ্নের দেশ গড়ার।

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়; কিছু কাল পরেই ক্ষমতালোভী কিছু অধিবাসীর অজস্র অনাচারে ক্ষত-বিক্ষত হয় দেশটি, ঘটে লক্ষ্যচ্যুতি। যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে অর্জিত হয়েছিল তাদের স্বাধীনতা, তাদেরই অনুসারীরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে দেশটিতে। অপর দিকে সাধারণ অধিবাসীরা হয়ে পড়ে ম্রিয়মান; প্রতি পদে অত্যাচারিত হচ্ছে জেনেও, কোনো এক অজানা কারণে তারা নিশ্চুপ-নিশ্চল-নিথর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অনিশ্চয়তার অসীম অন্ধকারে নিমোজ্জিত হতে থাকে দেশটির ভবিষ্যত। এ-ভাবেই চলতে থাকে সময়...

হঠাৎ-ই একদিন বিস্ময়ে মূর্ছা যাবার উপক্রম হয় অধিবাসীদের, তারা লক্ষ্য করে— দেশের সব বিশ্বাসঘাতক-লুটেরা-কুচক্রীদের কারা যেন এক রাতের ভেতর হত্যা করেছে একে একে, তাদের পরিচিত একজন অনিষ্টকারীও আর জীবিত নেই! নির্বাক হয়ে যায় সবাই— কারা ঘটালো এ-হত্যাকান্ড? কিভাবে? হত্যাকারীদের সন্ধান চলতে থাকে সারা দেশ জুড়ে, কিন্তু সামান্যতম কোনো নমুনাও রেখে যায় নি হত্যাকারীরা! তবে কারা? নিরলস সন্ধান চলতে থাকে...

তবে আশ্চর্য একটি বিষয় অচিরেই দৃষ্টিগোচর হয় অধিবাসীদের— সমগ্র দেশ জুড়ে তৈরি করা তাদের বীর যোদ্ধাদের মূর্তিগুলি উধাও হয়ে গেছে! মূর্তিগুলির

সামান্যতম ধ্বংসাবশেষেরও চিহ্ন নেই কোথাও! কিছুদিন পর নজরে আসে আরেকটি বিস্ময়! মূর্তিগুলি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল, তার পাদদেশে খোদাই করে লেখা, "তোমরা পারো নি, কিন্তু স্মরেছিলে; তারই প্রতিদান।"

আজ থেকে বছর সাতেক আগে গল্পটি শুনেছিল অন্তু, যে বয়সে বাস্তব আর রূপকথার পার্থক্য নির্ণয় বেশ দূরুহ। দাদুকে অনেক প্রশ্ন করেছিল অন্তু, আর দাদুও কথায় কথায় গল্পটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল অন্তুর কাছে। সেই অল্প বয়সেই অন্তু বুঝতে পারতো ওর নিজের দেশের অবস্থাও গল্পের দেশটির থেকে ভিন্ন কিছু নয়। প্রায়ই বাবাকে বলতে শুনতো— "এ-দেশের আর কিছু হবে না, সব পঁচে গেছে"। আসন্ন অন্ধকারের প্রচ্ছন্ন আভাস আর দেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান নিষ্ক্রিয়তা কিছুটা হলেও কষ্ট দিত অন্তুকে, যদিও কোনো কিছুই ঠিক স্পষ্ট ছিল না ওর কাছে। সেই সময়টাতেই দাদুর বলা গল্প মূর্তির জাগরণে মনে মনে বিশ্বাসী করে তুলেছিল ছোট্ট অন্তুকে। আজও মনে পড়ে কী অধীর অপেক্ষায় সে স্কুল মাঠের কোনোয় মুক্তিযোদ্ধার মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত গল্পটি শোনার পর থেকে। অন্তু তাকিয়ে থাকতো আর ভাবতো— মূর্তিটা যখন মানুষ হয়ে যাবে, তখন কি ওর শরীরে রক্ত বইবে? ওর চুলগুলো কি সাদা থেকে কালো হয়ে যাবে? ওর হাতের পাথুরে বন্দুকটা থেকে কি সত্যি সত্যিই গুলি বের হবে? মাঝে মাঝে এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্তুর মনে হতো মূর্তিটা যেন একটু কেঁপে উঠলো! ভয় পেত অন্তু, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারতো— কই না তো! মূর্তি তো মূর্তির জায়গাতেই আছে।

বাবার সাথে শহরে বেড়াতে গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের আরও অনেক মূর্তি দেখতে পেত অন্তু। অন্তুর বিশ্বাস আরও প্রগাঢ় হচ্ছিল বহু সংখ্যক মূর্তি দেখে— মূর্তিগুলো একজোট হলে ওদের রোখে কার সাধ্য!

দিন চলে যেতে থাকে, দেশে বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে ধ্বংসকারীর দল; কিন্তু কোথাও জাগরণের সামান্য আভাসটুকুও নেই— না মানুষের, না মূর্তির। এরই মাঝে একদিন অন্তুর বড় ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধর করে দুষ্কৃতিকারীরা— তার দোষ সে নিয়মিত পত্রিকায় স্বাধীনতার কথা লিখতো, মুক্তির কথা লিখতো, শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার কথা লিখতো। অন্তুর মনে পড়ে, ভাইয়ের কথা শুনে সেদিন এক দৌড়ে স্কুল মাঠের সেই মূর্তিটার সামনে চলে গিয়েছিল ও; অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "মানুষ কত শক্ত পাথর হলে তোমরা জাগবে?"

না, তার পরেও মূর্তি জাগেনি, জাগেনি মানুষও। যত দিন গেছে, মূর্তিরা তত মলিন হয়েছে— শরীরে পাখির বিষ্ঠা জমেছে, ধরেছে দীর্ঘ সব ফাটল; মানুষের বিদ্রোহী-সত্তার উপরও জমেছে স্থবিরতার স্তর, ফাটল ধরেছে সততার দৃঢ় মূলে।

আজ দীর্ঘদিন পর স্কুলের মাঠে মূর্তিটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অন্ত, আশেপাশে আরও অনেক মানুষ। না, এখন আর অন্ত ছেলেবেলার মতো নেই, কবেই সে সব বিশ্বাস উবে গেছে! তবে আজ চোখের সামনে যা দেখছে, তাতে সেই দিনগুলির কথা মনে না হয়ে পারে না। মুক্তিযোদ্ধার সেই মূর্তিটা মাটিতে ভেঙে পড়েছে, আর তার হাতের বন্দুকের বেয়নেটটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষের শরীর। মৃত ব্যক্তিটি এলাকার কুখ্যাত এক দুর্বৃত্তকারী রাজনীতিবিদ, একটু আগেই মূর্তিটার নিচে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিল উচ্চকণ্ঠে। হঠাৎ-ই মূর্তিটা পিছন থেকে ধ্বসে পড়ে তার উপর। অন্ত প্রায় নিস্পলক তাকিয়ে থাকে সেই অভাবনীয় দৃশ্যটির দিকে, যেভাবে তাকিয়ে থাকতো সেই কৈশোরে— জাগরণে বিশ্বাসের সেই দিনগুলিতে।

প্রকাশ : *স্লান*

ব্যথাহীন

বিস্তীর্ণ ধূ-ধূ প্রান্তর যেখানে দূরের ঐ সুউচ্চ পর্বতমালার পাদদেশে গিয়ে মিশেছে, সেখান থেকে এক কিশোরের কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে। ধূসরতা-রুক্ষতা-শূন্যতার নির্মম জয়জয়কার এ-প্রান্তরে, সুদূর অতীতের কোনো এক অজানা কাল হতে যা নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে আজ অবধি। অবিরাম অশ্রু ঝরিয়ে হেঁটে চলে কৃশকায় কিশোরটি, নির্জনতার নিরন্তর চোখ রাঙানিও তার অশ্রুসিক্ত দু'চোখে সামান্য ভীতি সঞ্চারে সফল হয় নি। কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু প্রায়ই কিশোরের কপোল গড়িয়ে ঝরে পড়ে ভূমির উপর, তৃষ্ণার্ত বালুকণার দল মুহূর্তেই শুষে নেয় তা। আজন্ম তৃষ্ণার্ত এ-বিরান ভূমি— বৃষ্টি ঝরে না এখানে, আকাশে জমে না মেঘ। দীর্ঘকাল এ-প্রান্তরে পড়েনি কোনো মানুষের পদচিহ্ন, সমতল বালুর স্তরের উপর কিশোরের পায়ের ছাপ তাই জমাট বাঁধা শুষ্ক পললের উপর নিশ্চিহ্ন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর শরীরের ছাপের মতো বিস্ময়কর মনে হয়।

পর্বতমালা ছাড়িয়ে কিছু দূর পার হয়ে এলে হঠাৎ-ই একটি ক্ষীণ মানব-কণ্ঠের শব্দ শুনতে পায় কিশোরটি— কেঁপে ওঠে সে, দীর্ঘক্ষণ পর তার ব্যথিত হৃদয় চকিত হয়।

—হে কিশোর! দয়া করে একটি বার দাঁড়াও।

বিস্মিত কিশোর কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়, চারপাশ ঘুরে খুঁজতে থাকে কণ্ঠস্বরের উৎস। বিস্ময়ের মাত্রা ত্বরিত হয় আরও, সে লক্ষ্য করে অদূরে একাকী দণ্ডায়মান একটি শীর্ণ বৃক্ষ–পত্রহীন, বাকলহীন; শুধুই কাণ্ড আর শাখা-প্রশাখাময়। কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবার সাথে সাথে বৃক্ষটির দেহে মৃদু কম্পন হতে দেখে কিশোর, বুঝতে পারে শব্দ ভেসে আসছে সেখান থেকেই। ক্ষণিক পরেই উপলব্ধি হয় কিশোরের— বৃক্ষটি বাকশক্তিপ্রাপ্ত!

—হে কিশোর, তুমি যেয়ো না। একটি বার দাঁড়াও, দয়া করে একটি বার দাঁড়াও।

—আমি তোমায় দেখে শঙ্কিত। বৃক্ষ হয়েও তুমি কথা বলে চলেছো কী করে? পূর্বে এমন বৃক্ষ আমি কোথাও দেখিনি।

—আমি তোমায় বলব, সব বলব হে কিশোর। শুধু কথা দাও, তুমি এখানে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করবে, ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনবে। আমায় ভয় পেয় না, করুণা কর। দয়া করে করুণা কর।

—বলো হে বৃক্ষ-মানব, তোমার কথা বলো। তবে তোমার কথা যদি শুধু দুঃখেরই হয়, তবে আমি শুনতে চাই না। আমার নিজের হৃদয়ই যে দুঃখ ভারাক্রান্ত, তাই তো পাহাড়ের ওপারের লোকালয় ছেড়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে এসেছি।

—আমি যদি তোমার দুঃখ চিরতরে বিলীন করে দিই? দেবে আমায় সে সুযোগ? একটি বার আমায় সুযোগ দাও।

—তা কী করে সম্ভব! কেউই অপরের দুঃখ ঘোচাতে পারে না বৃক্ষ-মানব। আমার পিতা বলেন–বিশ্বে আমরা সবাই একা, একাই লড়ে যেতে হবে চিরদিন।

—হে কিশোর, আমি মিথ্যা বলছি না। আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনলেই সব বুঝবে তুমি। শোন তবে...

আজ আমার যে বৃক্ষের শরীর, তা একদিন ছিল না। তোমার মতোই ছিলাম আমি— সম্পূর্ণ মানব শরীরের এক সম্পূর্ণ মানব। তবে আমি ছিলাম এমন এক দেশের অধিবাসী, যার নিয়ন্ত্রক এক রূঢ়-নিষ্ঠুর দেবতা— সামান্য অপরাধের শাস্তি সেখানে নির্মম! এই যে আমি আজ বৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এই শুষ্ক প্রান্তরে, তা এমনই এক অপরাধের জন্য। আমার রাজ্যে পানীয় জলের তীব্র সংকট। গভীর রাতে আমি যখন একদিন ঘুমন্ত ছিলাম, এক তৃষ্ণার্ত বৃদ্ধ আমার গৃহে এসেছিল একটু জলের আশায়। বৃদ্ধের ডাক শুনে আমি বিরক্তি বোধ করি, এবং তাকে বলি গৃহত্যাগ করতে। সেই আমার অপরাধ! সেই ক্ষণিকের অপরাধের জন্য আজ আমি দাঁড়িয়ে আছি এই নির্জন প্রান্তরে। আমার মৃত্যুও সম্ভবপর নয় এখানে, এই বৃক্ষ— দেহের মূলের সামান্য অংশ মাটি ফুড়ে ছুঁয়ে আছে পাতালের জলপৃষ্ঠে;- তাই আমি বেঁচে থাকি; বেঁচে থাকি কিন্তু ধুঁকি, ধুঁকি প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ক্ষণে।

—তোমার যন্ত্রণা যে আমার থেকেও বেশি, হে বৃক্ষ-মানব। এর থেকে কি কোনো মুক্তি নেই তোমার?

—আছে হে কিশোর, আছে। সে-কথাই তোমায় বলব আমি। দয়া করে চলে যেয়ো না। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার একটি মাত্র উপায় আছে। আমি যদি কারো দুঃখ লাঘব করতে পারি, নিঃশেষ করে দিতে পারি চিরতরে, তাহলেই এই বৃক্ষ— দেহ থেকে মুক্তি পাবো আমি। যেকোনো দুঃখী মানুষের দু'টি ইচ্ছাপূরণ করতে হবে আমায়, মাত্র দুটি। ইচ্ছা দু'টি প্রযোজ্য হবে শুধুমাত্র দু'জন মানুষের উপর, এবং অমরত্ব ছাড়া অন্য যে কোনো কিছু হতে পারে কাম্যবস্তু। বছরের পর বছর ধরে আমি অপেক্ষা করে আছি, অপেক্ষা করে আছি একজন দুঃখী মানুষের;

কিন্তু ভুলেও কারো আগমন ঘটে না এখানে, এ-রিক্ত প্রান্তর শুধু আমার মতো অভিশপ্তের আবাসভূমি। আজ আমি তোমায় কাঁদতে দেখেছি, নিশ্চই তোমার কোনো দুঃখ আছে। বলো কী তোমার দুঃখ? আমি মুহূর্তেই ঘুচিয়ে দেব সব, নিজেও পরিত্রাণ পাবো এই অভিশাপ থেকে।

—আমার সারা শরীরে প্রহারের চিহ্ন কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? আমার পিতা, আমার জন্মদাতা পিতা কি নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে আমায়! সবাই নিষ্ঠুর হে বৃক্ষ-মানব, সবাই নিষ্ঠুর। দুর্বল-ক্ষীণকায় আমি, খেলার সাথীরাও কারণে-অকারণে আমাকে আঘাত করে— ওদের কাছেও যে আমি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের পাত্র। হে বৃক্ষ-মানব, আমায় তুমি ব্যথাহীন করে দাও। যে যতই আঘাত করুক, আমাকে যেন আর ব্যথা পেতে না হয়, যেন কাঁদতে না হয়।

—হে কিশোর, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে। আমি কথা দিলাম তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে—তুমি সম্পূর্ণ ব্যথাহীন হয়ে যাবে, হাজার আঘাতও তোমার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। এবার তোমার দ্বিতীয় ইচ্ছাটি বলো।

—এই মুহূর্তে যে আমার আর কিছু মনে পড়ছে না। হয়তো একাধিক প্রত্যাশার কথা হয়ত বলা সম্ভব, কিন্তু তা তোমার অভিশপ্ত ক্ষমতার তুলনায় নগণ্য হবে। আমার যে ভাববার জন্য একটু সময় প্রয়োজন, বৃক্ষ-মানব। এই দুঃসহ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকাই আমার পক্ষে যে আর সম্ভব হচ্ছে না, আমি সিদ্ধান্ত নেব কী করে? আমি ব্যথাহীন হয়ে এখন দেশে ফিরে যাই, সেখানে গিয়ে অবশ্যই কিছুর প্রয়োজন বোধ করবো, আর সঙ্গে সঙ্গে তখন ছুটে এসে দ্বিতীয় ইচ্ছার কথা বলবো। আমি অবশ্যই ফিরে আসবো হে বৃক্ষ-মানব, তুমি দুঃখ করো না।

—তুমি আমায় এ কেমন দুর্বিষহ অপেক্ষায় রেখে চলে যাচ্ছো, হে কিশোর? আমায় মুক্তির মধ্যপথে দাঁড় করিয়ে রেখে তুমি এভাবে চলে যাবে? হয়ত এমনই হয়, হয়ত এ আমার শাস্তিরই অংশ। সত্যিই তো, তুমিই বা কেন এই দুর্লভ ইচ্ছাপূরণের সুযোগ হারাবে? তুমি যাও হে কিশোর, তুমি যাও; তবে নিজে ব্যথাহীন হয়ে ভেবো না পৃথিবীময় সকলে ব্যথাহীন হয়ে গেছে, আমি ব্যথাহীন হয়ে গেছি। দয়া করে আমার কথা ভুলো না, যত শীঘ্র সম্ভব আবার ফিরে এসো তোমার দ্বিতীয় ইচ্ছা নিয়ে। মনে রেখো, তোমার ইচ্ছাপূরণেই আমার মুক্তি।

—আমি ভুলবো না হে বৃক্ষ-মানব, আমি ভুলবো না। যে তুমি আজ ব্যথাহীন করে দিলে আমায়, যে তুমি আমায় মুক্তি দিলে শরীরের যন্ত্রণা থেকে, যে তুমি অভিশপ্ত হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছো এই ধূ-ধূ প্রান্তরে, যে তুমি অপেক্ষা করে থাকবে শুধু আমার একটি ইচ্ছা প্রকাশের— তার কথা আমি কিভাবে ভুলি? বিদায় হে বৃক্ষ-মানব, আমি শীঘ্রই ফিরে আসবো।

—বিদায় হে কিশোর, বিদায় হে আমার দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু, বিদায়। তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম, বিদায়।

কিছু দিন পর...

কিশোরকে আবার দেখা যায় প্রান্তরে। এবার সে কাঁদছে না, দৌড়াচ্ছে, দ্রুত বেগে দৌড়াচ্ছে, বহুদূর হতে চিৎকার করে বলছে, "হে বৃক্ষ-মানব, আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি আমার দ্বিতীয় ইচ্ছার সন্ধান। আজ তুমি মুক্তি পাবে, তোমার দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হবে আজ। কিশোরের চিৎকার শুনে যেন মোচড় দিয়ে ওঠে বৃক্ষটি; যতদূর পর্যন্ত তার শিকড় বিস্তৃত, ততদূর অব্দি ভূমি ক্ষণিকের জন্য মৃদু কেঁপে ওঠে।

—হে কিশোর, তুমি এসেছো? তুমি সত্যিই আবার এসেছো? এ নিঃসঙ্গ প্রান্তরে থেকে আমি বিশ্বাস করতে ভুলে গেছি। তবে আজ মনে পড়ে সত্যিই একদিন আমি বিশ্বাসী ছিলাম, বিশ্বাস করতাম মানুষকে; যদিও বিশ্বাস করে প্রতারিত হয়েছি বহুবার। কিন্তু হে কিশোর, তুমি আমায় প্রতিদান দিয়েছ, আমার অনন্ত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়েছো। তুমি জানো না, কী অধীর অপেক্ষায় আমি প্রতীক্ষা করেছি তোমার জন্য। আমি বুঝেছি, আশাহীন প্রতীক্ষার চেয়ে আশাময় প্রতীক্ষা সহস্রগুণ বেশি দুঃসহ। হে কিশোর, আমার ধৈর্যের আর পরীক্ষা নিও না; বলো তোমার দ্বিতীয় ইচ্ছা কী?

—হে বৃক্ষ-মানব, আমার প্রথম ইচ্ছা তুমি পূরণ করেছো। আজ আমি সম্পূর্ণ ব্যথাহীন, প্রবল প্রহারও আমার শরীরে বিন্দু মাত্র ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে না। সবাই আমায় দেখে বিস্মিত হয়, সমীহ করে; তাচ্ছিল্য করে না আগের মতো, ভাবে আমি ঐশ্বরিক ক্ষমতা পেয়েছি। কিন্তু তবুও যে আমি সুখি হতে পারিনি, হে বৃক্ষ-মানব। আমার শরীরের ব্যথা হয়ত লাঘব হয়েছে; কিন্তু যখনই রাজ্যের অজস্র বসনহীন ভিক্ষুক আমার চোখের সামনে পড়ে, যখন দেখি অনাহারক্লীষ্ট শিশুরা পথের পাশে অসহায় দাঁড়িয়ে আছে, জুলুমে জর্জরিত চাষাকে যখন দেখি রাজার অত্যাচারে ঘর ছাড়তে— তখন আমার হৃদয় আবার কেঁদে ওঠে। আমার এই ছোট্ট বুকটা ভেঙে তখন আবার দুঃখের প্লাবন বয়ে যায়, সহ্যশক্তি দিয়ে আমি আর তা আটকে রাখতে পারি না। হে বৃক্ষ-মানব! তুমি আমায় হৃদয়ের এ-ব্যথা থেকে মুক্তি দাও, চিরতরে মুক্তি দাও।

—হায় কিশোর! হায়! এ তুমি কেমন ইচ্ছার কথা শোনালে আমায়? এ ইচ্ছা পূরণ হলে যে তুমি আর মানুষ রবে না! ওই যে তুমি কেঁদে ওঠো বারেবার, ওই যে তোমার বুকে কষ্টের প্লাবন বয়ে যায়, তার জন্যই যে তুমি মানুষ, তোমার শ্রেষ্ঠত্ব যে অমলিন সে জন্যই।

—কিন্তু আমি যে এ-ব্যথা চাই না, নাই বা থাকলাম মানুষ তাতে। তুমি আমার ইচ্ছাপূরণ কর, কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দাও আমায়, নিজে মুক্ত হও অভিশাপ থেকে।

—না হে কিশোর! না! আমি যে আজও ভুলিনি একদিন আমি মানুষ ছিলাম, আমি যে কোনোদিন ভুলব না আমি মানুষ ছিলাম। নিজের মুক্তির জন্য আমি যে তোমার মানব-আত্মাকে বন্দি করতে পারব না, কিশোর। তোমার ইচ্ছা পূরণ হলে

তুমিই হবে বিশ্বের প্রথম মানব-শরীর, যার অন্তস্তল শূন্য, যে পাথর। হে কিশোর, আমি যে তা পারব না! তুমি চলে যাও, চিরতরে চলে যাও। আবার আমি অপেক্ষা করব, আবার শুরু হবে আমার প্রতীক্ষার প্রহর, আবার হয়তো কারও আগমন হবে এ-প্রান্তরে, হয়তো হবে না; তবুও তোমার এ-অনুরোধ আমি রাখবো না। তোমার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা শুনে মনে হয় তুমি এই ইচ্ছাপূরণে বদ্ধপরিকর; কিন্তু হে কিশোর আমি নিরুপায়, অসহায়, অসমর্থ। তুমি চলে যাও, আর কোনো দিন ফিরে এসো না; যন্ত্রণায় আর কাতর করে তুলো না আমায়।

—সমগ্র শরীরে ব্যথাহীন হয়ে আমি অন্তরের মর্মস্থলেও ব্যথাহীন হতে চেয়েছিলাম, হৃদয় উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। আমায় ক্ষমা কর হে বৃক্ষ-মানব, আমায় ক্ষমা করো। তুমি যে আজ আমার নতুন বোধোদয় ঘটালে, হে বৃক্ষ-মানব। মুক্তির দ্বারে দাঁড়িয়েও তুমি যে চেতনায় প্রবুদ্ধ হয়ে আজ অকাতরে রুদ্ধ করলে নিজের ভবিষ্যত, তার মহত্ত্বের আলোকচ্ছটায় আমি আলোকিত হলাম! না, বৃক্ষ-মানব! না! আমি মানুষই থাকতে চাই, হৃদয় আমার শতছিন্ন হোক ব্যথার প্রাবল্যে, তবুও আমি মানুষ থাকতে চাই। তবে প্রশ্ন জাগে, কতদিন আর সহ্য করে যাবো এভাবে?

—হে কিশোর! তুমি আবার আশার সঞ্চার করলে আমার এ ভগ্ন হৃদয়ে। তোমার হয়ত উপলব্ধি হয়েছে— ব্যথাহীনতা ব্যথার কাছে নির্লজ্জ পরাজয়ের নামান্তর, ব্যথাকে নির্মূলের প্রচেষ্টাই প্রকৃত বিজয়।

—তুমিই সঠিক হে বৃক্ষ-মানব, তুমিই সঠিক। আমার পূর্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল কাপুরুষ হবার হীন প্রত্যাশা। আমি আমার ইচ্ছা বদলে ফেলেছি।

—বলো তোমার নতুন প্রত্যাশার কথা। তবে আবার এমন কিছু বলো না যা পূরণের চেয়ে বৃক্ষ হয়ে থাকা শ্রেয়তর হয়।

—হে বৃক্ষ-মানব, তুমি আমারই মতন ব্যথাহীন হয়ে যাবে তোমার মানব শরীর ধারণের পর— এই-ই আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা। আমরা দুই ব্যথাহীন ব্যথা দূর করব মানুষের, সমগ্র জীবন কাটাবো ব্যথার নির্মূলে, শরীরে ব্যথা নিয়ে যা সম্ভব হবে না কোনো দিন। থাকবে তুমি আমার সাথে?

—থাকবো হে কিশোর, থাকবো, আজীবন থাকবো।

একটু পর বৃক্ষটি রূপান্তরিত হয় এক বৃদ্ধপ্রায় মানুষে— চোখে তার জল ঝরে পড়ে; জল ঝরে পড়ে কিশোরটির চোখ থেকেও। একে অপরকে আলিঙ্গন করে তারা অঝোরে কেঁদে চলে অনেকক্ষণ। ক্ষণিক বাদেই হাঁটতে থাকে তারা, হেঁটে পার হয়ে যায় সেই বিভীষিকাময় প্রান্তর, চোখে তাদের স্বপ্ন— বিরাজমান সকল ব্যথা দূর করবে তারা।

প্রকাশ : *ধমনি, বেঙ্গলি টাইমস*

আবিষ্কার

গভীর অরণ্য মাঝে তিনি হেঁটে চলেছিলেন অতি অদূর ভবিষ্যতের এক ক্রান্তি লগ্নের সম্মুখে, কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে। তাঁর পায়ের ধীর কিন্তু অক্লান্ত গতি নিঃসন্দেহে প্রতিকায়িত করে চলেছে এক নিগূঢ় গভীর অর্থ— এই যাত্রা শুরু হয়েছিল কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে, যার সন্ধান লাভ হয় নি এখনো। সুঠাম-সবল কিন্তু ক্ষত-বিক্ষত শরীরের উপর জমাট বাঁধা রক্ত স্মরণ করিয়ে দেয়— চেতনা-অবচেতনার পার্থক্য তার কাছে লুপ্ত হয়েছে বহু পূর্বেই, এবং মনোজগতে তিনি বিচরণ করে চলেছেন এই শ্বাপদসংকুল অরণ্য ছাড়িয়ে সুদূর-অচেনা কোনো রাজ্যে। তার পথ চলার এ-রূপ দুর্বার প্রকৃতি হয়তো নিমেষে উদ্বুদ্ধ করতো যে কোনো দুর্বল-হীনচেতা কাপুরুষকে; কিন্তু সঙ্গী হিসেবে তাঁর পাশে অবস্থান করছে না কেউ; একাই তিনি, তিনি একাই হেঁটে চলেছেন। মেঘমুক্ত নীল আকাশে উড়ে চলা এক ঝাঁক পাখি, স্পষ্ট ও প্রায় নিষ্পলক তাঁর দুই চোখে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে লক্ষ্য-জয়ের যে আগাম বার্তা দিচ্ছে, তার দর্শন প্রাপ্তিতে যে কোনো কবি হয়তো রচনা করতে পারতেন একটি কালজয়ী কবিতা; কিন্তু অরণ্য কবির আরাধ্য-ভূমি, বাসস্থান নয়; তিনি একাই, একাই তিনি হেঁটে চলেছেন। নিঃসঙ্গতাকে একমাত্র সঙ্গী করে তিনি হেঁটে চলেছেন...

যাত্রা পথে তিনি বহুবার আক্রান্ত হয়েছেন ভয়ঙ্কর সব বন্য প্রাণী কর্তৃক; কিন্তু প্রতি বারই সৈনিকের দক্ষতায় পরাস্ত করেছেন তাদের। তিনি যখন হাঁটেন, মনে হয় যেন হেঁটে চলেছে সদ্য ধ্যান শেষে উঠে আসা কোনো তপস্বী; কিন্তু আক্রান্ত হবার সাথে সাথেই জেগে ওঠে তার ঘুমন্ত পেশিবহুল শরীর, প্রবল আক্রোশে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুর উপর, অসামান্য দক্ষতায় নিশ্চিহ্ন করেন নিমেষে। প্রায়ই তাঁর আক্রমণের তেজ স্বাভাবিকতা ছাড়িয়ে চলে যায় অতিমানবীয় শক্তির পর্যায়ে, মনে হয় যেন যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছেন কোনো পৌরাণিক দেবতা; কিন্তু পর মুহূর্তেই, শত্রু পরাজিত হলে, তিনি ফিরে আসেন স্বাভাবিক রূপে। নিজেও তিনি বিস্মিত হয়ে যান তার শক্তির প্রাবল্যে, সদ্য পরাজিত ও রক্তাক্ত পশুর দিকে তাকিয়ে একই সাথে অবাক ও পুলকিত হন। লক্ষ্যে সমগ্র একাগ্রতা দিয়ে অবিচল থাকলেই কেবল সম্ভব এ-রূপ

অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্তি, যে একাগ্রতা তাকে দীর্ঘকাল ধরে পরিচালিত করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। একটি বারের জন্যও তিনি লক্ষ্যচ্যুত হন নি, ধৈর্যহারা হন নি, আতঙ্কিত হন নি, শঙ্কাগ্রস্ত হন নি। দীর্ঘ পদচারণা তাকে সামান্যতমও বিচলিত করতে পারে নি; বরং যতই তার যাত্রা অনন্ত হবার সম্ভাবনা জেগেছে, ততই তিনি হয়ে উঠেছেন অদম্য সাহসী। প্রতিনিয়ত বর্ধিষ্ণু সাহসকে লক্ষ্য জয়ের একমাত্র হাতিয়ার করে তিনি হেঁটে চলেছেন...

তিনি নিজ অস্তিত্বের প্রশ্নে আক্রান্ত এক আদিম তরুণ। তিনি কোনো দুঃখী মানুষ নন, পরাজিত মানুষ নন, ব্যর্থ মানুষ নন; জাগতিক প্রাপ্তির প্রায় সকল কিছুই তার মুষ্ঠিবদ্ধ। কালের বৈশিষ্ট্য হেতু তিনিও ছিলেন একটি গোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত, সবার কাছে পরিচিত ছিলেন একজন কর্মদক্ষ যুবক হিসেবে। শুধুমাত্র কর্মদক্ষই নন তিনি, কৈশোর হতেই একই সাথে গভীর চিন্তাশীল। উর্বর মস্তিষ্কের প্রয়োগে বহু দুরূহ ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি, এবং চিন্তাশীল থেকেছেন নিত্য নতুন বিষয় নিয়ে। কিন্তু অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তাশীল হবার মানসিক উৎকর্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন কিছু কাল পূর্বে, এবং সেই থেকে তাঁর চিন্তা নিমজ্জিত থেকেছে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই। তাঁর গোষ্ঠীতে চিন্তাশীল মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য, বহু জনের কাছে প্রশ্ন করেও তিনি পান নি কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর, আর তাই স্বভাবতই হয়ে উঠেছেন অস্থির। "তিনি কে? তিনি কেন? তিনি কোথায়?" ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁর মনোজগতে তৈরি করে মাত্রাধিক আন্দোলন, আর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁর জাগতিক ঔদাসীন্য ও উত্তর খোঁজার বাসনা।

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, সমগ্র জীবন প্রয়াস চালাবেন প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর সন্ধানের, কিন্তু এক পর্যায়ে উপলব্ধি করেন তাঁর সমগ্র জীবনই পতিত হয়েছে প্রশ্নের অসীম গভীরত্বের মাঝে। প্রশ্নই যেন তাঁর জীবন হয়ে উঠেছে, আর আকাঙ্ক্ষিত উত্তর হয়ে উঠেছে মুক্তি।

কিছু কাল পূর্বে, অমাবস্যার নিকষ-কালো রাতে, তিনি জোয়ার প্লাবিত এক স্রোতস্বীনি নদীর পাড়ে বসেছিলেন আকাশ পানে তাকিয়ে; সেই মুহূর্তেই, ভাবনার এক পর্যায়ে, তিনি চূড়ান্ত আক্রান্ত হন প্রশ্নটির অবাধ্য-প্রবল জোয়ার কর্তৃক। জোয়ারের প্রাবল্য এতই বেশি ছিল যে, নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেন নি তিনি; ক্ষণিকের পার্থক্যে উঠে দাঁড়ান সটান হয়ে, নিগূঢ় আঁধারে দিশার পরোয়া না করে দ্রুত বেগে এগিয়ে যেতে থাকেন সম্মুখ পানে। উন্মাদের মতো তিনি ছুটতে আরম্ভ করেন, কিন্তু উন্মাদনা তার মস্তিষ্ককে স্পর্শ করেনি কখনো; কারণ ইতোমধ্যে স্থির হয়ে গেছে তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। তাঁর সমগ্র চেতনায় তখন একটি লক্ষ্যই ভর করছে সমগ্র প্রভাব বিস্তার করে— অস্তিত্বের পূর্ণ উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত আর থামবেন না তিনি, সমস্ত

বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের মাঝে উপলব্ধি করে যাবেন নিজেকে, আর এভাবেই উপনীত হবার চেষ্টা চালাবেন নিজ অস্তিত্বের পরম সংজ্ঞায়।

সেই যাত্রার গতি আজও থেমে যায় নি, তিনি ক্লান্তও হন নি সামান্য পরিমাণে। বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি সময় অতিবাহিত করেছেন নিস্তব্ধ গুহার মাঝে, উত্তপ্ত ধূ-ধূ প্রান্তরে, সুগন্ধী ফুলের বিস্তীর্ণ মাঠে, ঝঞ্ঝা কবলিত ভয়ঙ্কর রাতে; তিনি অবস্থান করেছেন এমন অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থানে, এবং একাগ্র চিত্তে প্রয়াস চালিয়েছেন অস্তিত্ব অনুধাবনের। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর এখনও পেতে সমর্থ হন নি তিনি; যদি পারতেন, পূর্বেই থেমে যেত যাত্রা। তবে যাত্রা সম্পূর্ণ নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয় নি তাঁর, দীর্ঘ ভ্রমণের অশেষ অভিজ্ঞতা হেতু তিনি অর্জন করেছেন দুর্লভ সব উপলব্ধি। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধ গণ্ডির সংকীর্ণতা তাঁর মনোজগৎ হতে বিদায় নিয়েছে; তিনি উদার হয়েছেন, দৃঢ় হয়েছেন, নির্ভীক হয়েছেন।

আরও এক গভীর উপলব্ধি হয়েছে তাঁর, যা সম্পর্কে তিনি পূর্বে সামান্যতমও অবগত ছিলেন না। তিনি যাত্রা পথে যে স্থানে বা যে প্রান্তেই ছিলেন, কখনোই ব্যতিক্রম ঘটেনি একটি উপলব্ধির— নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হবার পূর্বশর্ত হল অপর কোনো কিছুর অস্তিত্বের অলঙ্ঘনীয় উপস্থিতি। গুহার মাঝে অবস্থান করে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে গুহার সাথে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তিনি সেখানে অবস্থান করছেন, উত্তপ্ত ধূ-ধূ প্রান্তরে অবস্থান করে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে ধূ-ধূ প্রান্তরের সাথে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তিনি সেখানে অবস্থান করছেন, সুগন্ধী ফুলের বিস্তীর্ণ মাঠে অবস্থান করে তাঁর উপলব্ধি হয়েছে বিস্তীর্ণ মাঠের সাথে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তিনি সেখানে অবস্থান করছেন, ঝঞ্ঝা কবলিত ভয়ঙ্কর রাতের মাঝে অবস্থান করে তার উপলব্ধি হয়েছে রাতের সাথে অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তিনি সেখানে অবস্থান করছেন। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও তাঁর উপলব্ধি হয় নি— তিনি আছেন, কিন্তু অপর কোনো কিছুর অস্তিত্ব অনুপস্থিত। এমন এক উপলব্ধির পর স্বভাবতই বিস্মিত হয়ে যান তিনি, যে বিস্ময় শেষ পর্যন্ত মুগ্ধতায় মিশে বিলীন হয়ে যায়। সেই অপার মুগ্ধতা তাকে নিজ অস্তিত্বের চেয়ে "অপর" অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তাশীল হতে প্রবৃত্ত করে, বারবার "অপর" অস্তিত্ব মাঝে তাঁর চেতনা থমকে দাঁড়ায়। মুগ্ধতায় ক্রমশ আচ্ছন্ন হতে থাকেন তিনি, যার সমাপ্তি ঘটে সর্ব "অপর"-এর সামষ্টিক ব্যপ্তির একক বিশালতার মাঝে নিজেকে সমর্পণের মধ্য দিয়ে। তার যাত্রা নতুন গতি পায়, তিনি এগোতে থাকেন; সমগ্র "অপর" অস্তিত্বের, যার সাথে তিনি আবদ্ধ সংজ্ঞাহীন এক সম্পর্কসূত্রে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবিষ্কার তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

হেঁটে চলেছিলেন তিনি, স্থবিরতা তাঁর কাছে কাম্য নয় কখনোই; কারণ তিনি

চান প্রমাণ, মনোলোকে আবিষ্কৃত হওয়া এক দৃপ্ত বোধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবে এখনো পর্যন্ত প্রমাণের সম্মুখীন হন নি তিনি, তাই যাত্রা চলছেই...।

এভাবেই যাত্রা পথে তিনি এসে পড়েছেন অরণ্য ছাড়িয়ে এক পর্বতবেষ্টিত স্থানে, যদিও তাঁর নিমগ্ন চিত্তে স্থানের প্রভেদ ধরা পড়েনি। আরও একটি প্রভেদ ধরা পড়েনি তাঁর কাছে— মুগ্ধতা তাকে ক্রমশ বিশ্বাসী করে তুলেছে, এবং প্রতিনিয়ত তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রত্যাশায় অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন। হঠাৎ-ই বিশ্বাস দুর্দমনীয় হয়ে অগনুদ্গারের মতো তাঁর মুখগহ্বর হতে বেরিয়ে আসে গগন বিদারী চিৎকার হয়ে–"বলো, আছি-ই-ই-ই-ই-ই..."। সেই চিৎকার পর্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে, "বলো, আছি-ই-ই-ই-ই..."। কিন্তু ততক্ষণে বিশ্বাসী মন তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে করে ফেলেছে একান্ত অনুগত, তাই দু'টি শব্দ পরিস্রুত হয়ে প্রবেশ করে শুধুমাত্র "আছি-ই-ই-ই-ই..." হয়ে, এবং নিজ কণ্ঠের প্রতিধ্বনিও সেই ক্রান্তিলগ্নে মনে হয় অতিপ্রাকৃতিক। তিনি নিশ্চিত! তিনি সফল! তিনি বিজয়ী! তিনি আবিষ্কর্তা! আনন্দের প্রাবল্যে মূর্ছা যান তিনি।

সম্বিত ফিরে পেলে দীর্ঘকাল পর পেছন ফিরে তাকান তিনি, মুহূর্তেই রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করেন নিজ গোষ্ঠীর কাছে ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে— তাঁর মহান আবিষ্কারের কথা সবার জানতে হবে যে! তিনি ছুটতে থাকেন, প্রবল বেগে ছুটতে থাকেন; পড়ে থাকে পর্বতবেষ্টিত সেই স্থান, অতি অদূর ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি হবার অপেক্ষায়।

প্রকাশ : *শাশ্বতিকী, স্নান, নতুনদেশ*

এক শহরে একদিন আমি

অফিসের দরজা ঠেলে বাইরে বের হলাম, বিশ্রী-গুমট-অস্বস্তিকর হাওয়া যথারীতি ভ্যাপসা অভ্যর্থনা জানালো। প্রতিদিন বিকালের এই মুহূর্তটি আমার কাছে একই সাথে বেশ কিছুটা বিরক্তিপূর্ণ ও সুখকর। অফিসের একঘেয়ে-ক্লান্তিকর কাজের শেষ হয় প্রতিদিন এই সময়ে, আমি মানসিকভাবে কিছুটা সুস্থ বোধ করতে থাকি, হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু অফিস ত্যাগের সাথে সাথে আমাকে ত্যাগ করতে হয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষটি; আমার কাছে যা সবসময়ই বেশ কিছুক্ষণের জন্য অসহনীয় মনে হয়। মাঝে মাঝে আমি ভাবি— হয়তো ওই আরামদায়ক কক্ষটির জন্যই আমি চাকরি করে চলেছি এতোদিন; ফাইল-কলম-ডেস্ক-কাউন্টিং-টাইপিং সবই বিরক্তিকর আমার কাছে, একমাত্র ওই আরামদায়ক কক্ষটি বাদে। তবে শুধুমাত্র একটি কক্ষকে জীবিকার প্রেরণা ভাবতে আমার আপত্তি আছে, আমি কিছুটা কুণ্ঠা বোধ করি।

তাপমাত্রার তারতম্য শরীরে মানিয়ে নিয়ে আমি রাস্তায় হাঁটতে থাকি, দূরে একটি রিক্সা দেখতে পেয়ে রিক্সাওয়ালাকে ডাক দিই। রিক্সাওয়ালাটির বয়স বেশ কম, যা আমার কাছে চালক হিসেবে তার প্রাথমিক অযোগ্যতা বলে মনে হয়। আমার পক্ষপাতিত্ব আছে বয়স্ক রিক্সাচালকদের প্রতি, যদিও তাদের চালাবার ধীরগতি অল্পবয়স্কদের রিক্সায় চড়তে আমায় বাধ্য করে বরাবর। নবীন রিক্সাওয়ালা বাসস্ট্যান্ডে যেতে আমার কাছে আট টাকা ভাড়া চায়, আমি কিছুটা অবাক হই— চালের দাম বাড়ার পর থেকে বাসস্ট্যান্ড অব্দি ভাড়া দশ টাকাই স্বীকৃত। আমি কোনো কথা বলি না, ভাড়ার কথা উল্লেখ করি না, রিক্সায় উঠে পড়ি। রিক্সা চলতে থাকে, আমি নিজের কাছে কিছুটা অসৎ হয়ে উঠি, অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। রিক্সাওয়ালাকে কি আমি ঠকাচ্ছি? সঠিক ভাড়া জেনেও, কেন আমি তা উল্লেখ করলাম না? মাত্র দুই টাকার জন্য আমি কি নীচে নেমে যাচ্ছি? কিন্তু এমন নয় যে রিক্সাওয়ালা বাসস্ট্যান্ড চেনে না, আর ও নিজেই ওই ভাড়া চেয়েছে; তাহলে আমার দোষ কোথায়? নিজের শ্রমের মূল্য ও নিজেই চেয়ে নিয়েছে, আমার তো সেটাই দেওয়া উচিৎ। আমি অনুমান করি, রিক্সাওয়ালাটি এই এলাকায় নতুন, সব জায়গার ভাড়া এখনো জেনে উঠতে পারেনি; ও হয়তো মানুষ

হিসেবে ঠিক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, এই এলাকার রিক্সাওয়ালাগুলোর সাথে হয়তো ওর অন্তরঙ্গতা ঠিক মতো গড়ে ওঠেনি, এবং এটাই ওর ভাড়া না জানার কারণ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রিক্সা মোড় ঘুরে মেইন রোডে এসে পড়ে; আমি রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে চিন্তা করা বাদ দিই, বা চিন্তা হঠাৎ-ই থেমে যায়, কারণ বুঝে উঠতে পারি না। হয়তো প্রধান সড়কের কোলাহল আমার মনোযোগে ব্যঘাত ঘটিয়েছে, বা এতো মানুষের উপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই একজনের চিন্তা রহিত হতে বাধ্য। তাছাড়া রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে আমি ভাবছি-ই বা কেন? ও কি আমার ভাবনার বিষয় হবার জন্য যথেষ্ট যোগ্য নয়? না হবারই বা কী আছে? আমি তো এমন মহৎ কিছুর চিন্তায় কখনোই ব্যস্ত থাকি না, বা পছন্দ করি না, যাতে রিক্সওয়ালার চিন্তা আমার মস্তিষ্কের অপচয় ঘটাবে।

আমার দিন শুরু হয় মোবাইল ফোনের অসহনীয় এলার্ম শুনে; আমি অনেক সুরেলা শব্দ ব্যবহার করেছি অ্যালার্ম হিসাবে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, কিন্তু অ্যালার্ম হিসেবে সমান বিরক্তিকর; আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি— অ্যালার্ম হিসেবে বোথোভেন-মোজার্ট-এ.আর.রহমানের সম্মিলিত মেধাসম্পন্ন কোনো সুরকারের সুরও ব্যর্থ হবে। প্রাত্যহিক ঘুম থেকে ওঠার মুহূর্তে আমার এই বিরক্তি, আমার সমগ্র দিন যাপনের প্রতীক হিসেবেও বেশ অসাধারণ; কারণ অতঃপর সারা দিন জুড়ে আমার বিভিন্ন কার্যকলাপ, খুব কম ক্ষেত্রেই, দীর্ঘস্থায়ী ভাবে ভিন্ন কোনো অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়। ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যাওয়া-মুখ ধোয়া-শেভ্ করা-স্নান সারা-নাস্তা করা এমনই অপরিবর্তনীয় একঘেয়েমি আমার কাছে যে, এগুলি করার মুহূর্তে আমার মনেই হয় না— আমি সত্যিই কিছু করছি। তবে সকাল বেলার কাজগুলির মধ্যে শেভিং একঘেয়েমি ছাপিয়ে অসহ্য হয়ে ওঠে প্রায়ই, যা অনেক সময় আমার কাছে বেশ অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠা কিছু লোম কর্তনের প্রয়োজন মানুষ ঠিক কেন অনুভব করলো, আমার কাছে তা ঠিক বোধগম্য নয়। এমন তো নয় যে, দাঁড়ি-গোঁফ নিয়ে থাকতে পারে না মানুষ; বরং কেউ কেউ থাকতে পারে বেশ স্বচ্ছন্দেই, অনেকের কাছে পৌরুষদীপ্ত হয়ে। সমস্ত দিনে, শেভিং-এর পর থেকে রাতে ঘুমানোর আগ অব্দি, জনবহুল বাস ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই সমপরিমাণ অসহ্য নয়। বেশিরভাগ কাজই আমার কাছে অসহ্য নয়, তার কারণ এই নয় যে, সেগুলিকে আমি সহ্য করতে পারি; বরং আমার মনে হয়— প্রাত্যহিকতা ওগুলিকে আমার কাছে অসহ্য মনে হবার জন্য যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছে। তবে রাতের ঘুমকে আমার বেশ শান্তিপূর্ণ বলে মনে হয়, তবে খুব বেশি নয়; কারণ ঘুমের অবস্ পূর্বানুভূতিই কেবলমাত্র সুখকর, কিন্তু তার স্থায়ীত্ব অত্যন্ত নগণ্য।

যার দিন নিয়মিত এভাবে চলে যায় বিন্দুমাত্র মস্তিষ্ক প্রয়োগ ছাড়া; সে এমন একজন রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে ভাবতেই পারে, যা কোনোক্রমেই তার সমগ্র জীবনযাপনের তুলনায় বেশি হাস্যকর হতে পারে না। আমি জানি না আমার মতো মেধাপ্রয়োগহীন জীবন যাপন করে যারা, তারা রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে ভাবে কিনা। তবে হঠাৎ-ই আমার রিক্সা উপস্থিত হয় এমন দু'জনের সামনে, যারা মেধাবী-অমেধাবী ভেদে সকলের চিন্তার বিষয়বস্তু হবার জন্য যথেষ্ট। আমি দেখতে পাই দু'জন অল্পবয়স্ক সুন্দরী মহিলা আরেকটি রিক্সায় চড়ে সামনে থেকে আসছে; দু'জনই হেসে চলেছে অনবরত, একজনের হাসি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত, ও অপর জনের বোধহীন। আমার মনে হয় মহিলারা, বুদ্ধিদীপ্ত বা নির্বোধ-উভয় হাসির ক্ষেত্রেই, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই হাসে, এবং তা নিরেট কৃত্রিম। তাদের হাসির কৃত্রিমতার পরিমাণ নির্ণয় আমার পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য; কারণ অন্তরঙ্গতা ছাড়া তাদের প্রকৃতি নির্ণয় সম্ভব নয়, যে ক্ষেত্রে আমার রয়েছে কিছুটা অনিচ্ছা, তার চেয়েও বেশি অযোগ্যতা। ইতোমধ্যে তাদের রিক্সাটি আমার পেছনে চলে গেছে, এবং আমি বুঝতে পারি— আমি তাদের নিয়ে ভাবা শুরু করেছি। আমি অনেক দিন আগেই উপলব্ধি করেছিলাম : সুন্দরীদের দেখার সময় আমি কিছু ভাবতে পারি না, এবং যখনই আমি তাদেরকে আর দেখতে পারি না, তখনই ভাবা শুরু করি; আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রিক্সাওয়ালা সম্ভবত দু'জন সুন্দরীকে দেখার পর বেশ উৎফুল্ল হয়েছে, রিক্সার গতির উপর তার বেশ প্রভাব পড়ছে। এ ধরনের অনুপ্রেরণা বেশ সুস্থ ও প্রয়োজনীয় মনে হয় আমার, যদি তার বহিঃপ্রকাশ বিকৃতির পর্যায়ে না পৌঁছায়। খুব কম মানুষেরই অনুপ্রেরণা দেবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আছে আমাদের দেশে— অনুপ্রেরণার পূর্বশর্ত নিজের সাফল্য, যা ভয়ঙ্কর ব্যর্থ মানুষের এই দেশে শোচনীয়ভাবে বিরল। যেখানে অনুপ্রেরণা বৃদ্ধ নিষ্কর্মাদের অলস কালক্ষেপণ আর মধ্য বয়স্কদের নগ্ন টিটকারী, সেখানে একজন সুন্দরী নারীর সৌন্দর্য পরোক্ষভাবে অনুপ্রেরণা হিসেবে অবশ্যই উৎকৃষ্টতর।

রিক্সা বাস্‌স্ট্যান্ডে এসে উপস্থিত হয়; আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, রিক্সাওয়ালা আমাকে নামতে বলে। আমি নেমে পড়ি, মানিব্যাগ বের করি পকেট থেকে, আবার সেই অস্বস্তিবোধ শুরু হয়। আমি ভাবতে থাকি— রিক্সওয়ালাকে কতো টাকা দেওয়া উচিৎ। যদিও এখন আট টাকা দিলে রিক্সাওয়ালা কিছুই মনে করবে না, নিয়ে নেবে বিনা বাক্যব্যয়ে; তবুও আমার অস্বস্তিবোধ অস্বস্তিতর হতে থাকে। আমি রিক্সায় ওঠার আগে সঠিক ভাড়ার কথা উল্লেখ করিনি, সেটা আমার কাছে গৌণ অপরাধ; কিন্তু এখন যদি আমি সত্যিই ভাড়া না দিই, সেটা হয়তো ঘৃণ্যতম হবে। রিক্সা থেকে নেমে আমি কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থাকি চুপচাপ, রিক্সাওয়ালা হয়তো কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'স্যার, ভাড়াডা দেন'। আমি মানিব্যাগ থেকে দশ

টাকার একটি নোট বের করি, রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে বলি, "দু' টাকা ফেরত দাও"। রিক্সাওয়ালা সাথে সাথেই দুই টাকা ফেরত দেয়, আমি নিয়ে নিই, এবং বুঝতে পারি— আমি আর অস্বস্তিতে ভুগছি না।

বিষয়বস্তু যতোই তুচ্ছ হোক, চিন্তার একটি বিশেষ সুফল হলো, তা সহজেই পরিপার্শ্বকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। রিক্সাওয়ালা চলে যেতেই আমার ভাড়া সংক্রান্ত সকল চিন্তার শেষ ঘটে, এবং আমি বাসস্ট্যান্ডের ময়লা উপচে পড়া ডাস্টবিনের উৎকট গন্ধ পেতে থাকি। বাসস্ট্যান্ডের এই নোংরা ডাস্টবিনটি আমি দেখে আসছি কয়েক বছর ধরে, সমান কৃতিত্বের সাথে সেটি দুর্গন্ধ ছড়িয়ে চলেছে। আমি অনেকটা নিশ্চিত— ওটি দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যাবে আরও অনেক দিন, বাসস্ট্যান্ডের নিজস্ব গন্ধ হিসেবে। ডাস্টবিনটিকে আমি ঘৃণা করে এসেছি সব সময়, চেয়েছি ওটি নিশ্চিহ্ন হোক; কিন্তু যেহেতু আমার কিছুই করার নেই, আমি মনে মনে ওটার প্রধান গুরুত্বের, আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে, কথা ভেবে দুর্গন্ধ ভুলে থাকার চেষ্টা করেছি। যখন আমরা অপারগ হই, কিছুই করার থাকে না আমাদের; সেই পরিস্থিতিকে কোনো এক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আত্মপ্রসাদ পেতে পারি আমরা; যা বেশ হীন, কিন্তু কার্যকর মানবীয় বৈশিষ্ট্য।

একটু পর বাসের হেলপার হাঁক দেওয়া শুরু করে, আমি দেরি না করে বাসে উঠে পড়ি। এখনও পর্যন্ত বাস বেশ ফাঁকাই আছে, যদিও একটু পর থাকবে না, এবং আমার মনে হতে থাকবে— আমি শুয়োরের খোয়াড়ে ঢুকে পড়েছি। বাসযাত্রীদের আমি এটা ভেবে অপমান করছি না, কারণ ওই মুহূর্তে নিজেকেও আমার একই শ্রেণীভুক্ত মনে হয়। যেকোনো ভিড় বা কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে, মানুষ একমাত্র নিজেকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, ও অন্য সবাইকে অসহ্য অপ্রয়োজনীয় অপদার্থ; কিন্তু আমি নিজেকে এই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছি। বাসের ভেতরে থেকে হয়তো ক্রমবর্ধমান ভিড়কে কেউ মনে করতে পারে অন্য কোনো পশুর কুরুচিপূর্ণ সমাবেশ, কিন্তু আমার কাছে তুলনা হিসেবে শুয়োরের পালই উপযুক্ত মনে হয়। দুর্গন্ধ-চাপাচাপি-ঠেলাঠেলি-গুঁতাগুঁতি-ঘোঁতঘোঁতানি কোনোটা নেই একটি লোকাল বাসে, যা একটি মাঝারী আকারের শুয়োরের পালের সাথে তুলনীয় হতে পারে না? বাসের হেলপারগুলো যেন শুয়োরের পালের নিয়ন্ত্রণকারী; একই প্রজাতির হয়েও, বিভৎস নোংরা ভাষার ব্যবহারে যাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে—ইচ্ছামতো ঠেলে সরাচ্ছে, ভাড়া আদায় করছে, কোনো কিছুর তোয়াক্কা করছে না। আমার কাছেও ভাড়া নিতে এসে পড়ে হেলপার, আমার ওকে 'তুই একটা বেয়াদব' বলতে খুব ইচ্ছা করে, কিন্তু বলি না— হয়তো বলার জন্য যথেষ্ট সাহসী হয়ে উঠতে পারছি না বলে।

মহামতি দম্বল

—মহারাজ, একটি বার কি আমার অনুরোধ বিবেচনায় আনা যায় না? দয়া করুন মহারাজ, একবার দয়া করুন।

—শীতাংশু, তোমার ইচ্ছা অতি অযৌক্তিক, হাস্যকরও বটে। তোমার ইচ্ছাপূরণ সম্ভব নয়, অতএব মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

—কিন্তু মহারাজ, মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছা পূরণের অধিকার তো এ রাজ্যের নিয়ম। পূর্বে এমন বহুবার হয়েছে।

—তাদের ইচ্ছাপূরণ করা এতটা কষ্টসাধ্য ছিলো না। তুমি আর কথা বাড়িও না, ভেবে নাও শূলে চড়ে গেছো।

—মহারাজ, যে অভিযোগের জন্য আজ আমার মৃত্যু হতে যাচ্ছে, তা আমি কখনোই ছিলাম না। আমি কখনোই রাজদ্রোহী ছিলাম না, কখনোই না। আমি কবিয়াল; সারা জীবন এই রাজ্যের রূপ-গুণের কথা সুর করে গেয়ে গেছি, রাজ্যের প্রতিটি ধূলিকণাকে হৃদয় নিঙড়ে ভালোবেসেছি, আমার সামান্য কবিত্ব দিয়ে তাদের জয়গান করেছি...

—চুপ করো, শীতাংশু। তুমি যা বলছো, তা যদি সত্যি হতো, তাহলে মহামতি দম্বল তোমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনতেন না। তোমার গানে অবশ্যই আপত্তিকর কিছু আছে।

—মহারাজ, আমি মানি মহামতি দম্বল আমাদের রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস। তাঁর মতো শিল্পবোদ্ধা শুধু আমাদের রাজ্যে কেন, আশেপাশের কোনো রাজ্যেও নেই। কিন্তু মহারাজ, আপনিও বোধ করি স্বীকার করবেন যে, মানুষ মাত্রই ভুল হয়।

—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! তুমি মহামতি দম্বলের বিচার নিয়ে প্রশ্ন তুলছো? পূর্বে কোনো দিন কি তার শিল্পবিচার ভুল হয়েছে? হতেই পারে না। উনি এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্প বিচারক, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী; আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। তোমার গানে অবশ্যই আপত্তিকর কিছু আছে, শীতাংশু। উনি কেন বৃথা অভিযোগ করবেন তোমার বিরুদ্ধে? তাছাড়া তুমি তো একা নও, তোমার আগে অনেক কবিয়ালই...

—মহারাজ, যদি কৃপা করেন তো বলতে পারি, গানের কোনো চয়নের জন্য

পনেরো-বিশ মিনিট পর গন্তব্যে পৌঁছালে আমি বাস থেকে নেমে পড়ি, খোয়াড় থেকে মুক্তি পাই । বাসস্ট্যান্ডে নেমে আমি বাড়ি পৌঁছাতে আবার রিক্সার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, কিন্তু সহজে পাই না, খোয়াড় থেকে মুক্তির পর আমি এমন কিছু আশা করি নি। আমি সিদ্ধান্ত নিই— পায়ে হেঁটেই বাসায় ফিরবো, যতক্ষণই লাগুক। আমি হাঁটতে থাকি, এখনও কোনো রিক্সা দেখতে পাইনি; আমি সিদ্ধান্ত না নিলেও হয়তো আমাকে হেঁটেই বাসায় যেতে হতো। আমি প্রায় বাসার কাছে চলে এসেছি, নিজেকে এতদূর হাঁটার জন্য বিশেষ কিছু মনে করছি; হঠাৎ-ই একটি রিক্সা দেখতে পাই। এখান থেকে বাসার দূরত্ব রিক্সায় ওঠার জন্য যথেষ্ট নয়, তাছাড়া আমি রিক্সায় না ওঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগেই, তবুও রিক্সাটি দেখার পর একটি প্রচণ্ড বিরক্তিবোধ আমায় পেয়ে বসে— রিক্সাটিকে আমি দেখতে পেলাম তখনই, যখন কোনোক্রমেই ওঠা সম্ভব নয়। সমস্ত বিরক্তিবোধ যেন আমার টুঁটি চেপে ধরেছে, আমি রাস্তায় হেঁটে চলেছি; আমি যে প্রতিটি মুহূর্তে বিরক্তিবোধ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি, তা ভাবতেই নতুন এক বিরক্তিবোধ আমায় পেয়ে বসে, আমি হাঁটতে থাকি, বিরক্ত হই, আবার বিরক্ত হই, এবং হাঁটতে থাকি ...

আমার মৃত্যু আজ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

—বলতে পারো, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি সর্বজ্ঞ নই। মহামতি দম্বলের তুলনায় আমার শিল্পজ্ঞান অতি নগণ্য। তোমার গানের কথা ও সুরের আড়ালে হয়তো এমন কিছু লুকিয়ে আছে, যা আমি উপলব্ধি করতে পারবো না, কিন্তু মহামতি দম্বল ঠিকই পেরেছেন।

—মহারাজ, তবুও আপনি দয়া করে শুনুন—

"ঘুরেছি কতো ভিন্ন পথে
লুটিয়েছি কতো অজস্র মতে,
সবই শূন্য-অসার ভাই
কিছুই হেথা পাবার নাই।"

এই হলো আমার গান, মহারাজ। এখানে কোথায় রাজদ্রোহ? কোথায় স্বদেশের অপমান? আমি সহজ মানুষ, সহজ কথা বলি। সেই কথা যদি জাঁতাকলে পিষে ভিন্ন অর্থ করা হয়, তাহলে আমি নিরুপায়। মহামতি দম্বল আমার গানের কথার ভিন্ন অর্থ করেছেন। আমার গানের কথক-কে তিনি হাঁটিয়েছেন আমাদের রাজ্যের পথে; "কিছুই হেথা পাবার নাই"-এর অর্থ করেছেন এই রাজ্যের সাপেক্ষে। কিন্তু মহারাজ, আমার গানের এ পথিক সমগ্র বিশ্ব সংসার মাঝে এক চিরন্তন পথিক ; আর "পাবার নাই"-এর অর্থ হলো পরম প্রাপ্তির শূন্যতা। আমি এই গানে আমার রাজ্যের কথা বলি নি, মহারাজ; আমি বলেছি সেই রাজ্যের কথা, যার অধিবাসী এই বিশ্ব জগতের সকলে।

—তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না, শীতাংশু। মহামতি দম্বল এমন ভুল করতে পারেন বলে মনে হচ্ছে না।

—মহারাজ, আমাকে একবার সুযোগ দিন। আমি প্রমাণ করে দেবো, কিভাবে মহামতি দম্বল সুচতুর মস্তিস্ক খাটিয়ে গানের কথার ভিন্ন অর্থ করে, আমাদের সাজা দিয়ে আসছে গত তিন যুগ ধরে।

—তোমার কথা কিছুটা হলেও আমায় ভাবিয়ে তুলছে। আচ্ছা, বলো তোমার পরিকল্পনা।

—আপনার দয়ার শেষ নেই মহারাজ, আপনার দয়ার শেষ নেই। আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তার জন্য যাদুকর দোসুতির সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। উনি ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয়, মহারাজ। মহান যাদুকর দোসুতিকে আমার চাই-ই চাই।

—কিন্তু কেন?

—মহারাজ, সভায় উপস্থিত এতো মানুষের সামনে তা বলা অসম্ভব। তবে যাদুকর দোসুতিকে পেলে মাত্র তিন দিনের মধ্যে আমি প্রমাণে সক্ষম হবো, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই। কিন্তু আপনার আদেশ ছাড়া দোসুতির সাহায্য পাওয়া অসম্ভব।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে মনে রেখো, যদি প্রমাণে ব্যর্থ হও, তাহলে তুমি

তো মরবেই, তার আগে তোমার সামনে তোমার স্ত্রী-পুত্রের গর্দান নেওয়া হবে। ভুলে যেয়ো না, তুমি মহামাণ্য দম্বলের দিকে আঙুল তুলেছো।

সিপাহী, ওকে ছেড়ে দাও, আর যতো দ্রুত সম্ভব যাদুকর দোসুতিকে খবর পাঠাও।

তিন দিন পর...

–মহারাজ! মহারাজ! আমি পেরেছি, মহারাজ! আমি পেরেছি! বছরের পর বছর আমার নির্দোষ কবিয়াল ভাইয়েরা দম্বলের প্রকোপে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে রাজদ্রোহের অভিযোগে, অসামান্য কবিত্ব নিয়েও অকালে ঝরে পড়েছে দম্বলের মিথ্যাচারে। আমি আজ তার প্রতিশোধ নেবো মহারাজ, প্রতিশোধ নেবো!

—থামো, উন্মাদ কোথাকার! প্রলাপ থামাও, কী হয়েছে বলো।

—মহারাজ, দম্বলের একটি গানের সাথে আপনি অবশ্যই পরিচিত আছেন। সেই যে—

"ঘ্রাণে ঘ্রাণে মাতোয়ারা মন
জানি না কবে মানবে বাঁধন..."

—হ্যাঁ, এটি তো মহামতি দম্বল রচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রেমের গান। এ গান তো এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে, মহারাণীরও অত্যন্ত প্রিয় গান এটি।

—হ্যাঁ, মহারাজ, হ্যাঁ। সমগ্র রাজ্যের মানুষ এই গান জানে। এমন কিছু জনপ্রিয় গান সৃষ্টির জন্যই, আমাদের মতো সাধারণ এক কবিয়াল দম্বল আজ মহামতি দম্বলে পরিণত হয়েছে, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পবোদ্ধার মর্যাদা পেয়েছে। মহারাজ, এইবার আজ্ঞা দিলে বলতে পারি আমার প্রমাণের বিস্তারিত বর্ণনা।

—বলে ফেলো।

—আপনার কৃপায় যাদুকর দোসুতি দু'দিন পূর্বে আমার নিকট আসেন। আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, ওনার একটি বিশেষ ক্ষমতা হচ্ছে মানুষের সমগ্র স্মৃতি থেকে ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ কোনো স্মৃতিকে বিলোপ করে দেওয়া। আমার অনুরোধে দোসুতি দম্বলের স্মৃতি থেকে চিরতরে মুছে ফেলেন একটি তথ্য, তা হলো– দম্বল নিজেই উল্লেখিত প্রেমের গানটির রচয়িতা। পরদিন আমি এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে দিয়ে এই গানটিই দম্বলের নিকট পাঠাই বিশ্লেষণ ও শিল্পগুণ বিচারের জন্য। দম্বল একটু পরেই জানিয়ে দেন তাঁর লিখিত মতামত। দেখুন মহারাজ, এই হলো দম্বলের মন্তব্য...

সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ পত্রটি সম্পূর্ণ পড়ার আগেই মহারাজের নজরে আসে এর সর্বশেষ বাক্যটি, পাঁচটি শব্দ যেনো লেখা হয়েছে একটু বেশি যত্নের সাথেই–"...অতএব ইহার রচয়িতা একজন রাজদ্রোহী।"

প্রকাশ : *শাশ্বতিকী, সোনাঝুরি*

নিরাপত্তা

রাহাত সাহেব টাকাভর্তি ব্রিফকেসটা আবারও একবার খুলে দেখলেন। সব কিছু ঠিকঠাক আছে বলেই মনে হচ্ছে—গার্ডার দিয়ে বাঁধা পাঁচশ টাকার বিশটি বান্ডিল, একপাশ পিন্ দিয়ে আটকানো। একটু আগেই ব্যাংক থেকে টাকাগুলি নিয়ে এসেছেন রাহাত সাহেব। বরাবরের মতোই আসার সময় একটু সন্ত্রস্ত ছিলেন তিনি, তাই স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তবুও ঘরে ঢুকে অভ্যাসবশত ব্রিফকেসটি খুলে আবার টাকার বান্ডিলগুলি নেড়েচেড়ে দেখলেন তিনি; এখন ওটি সিন্দুকে রেখে দিলেই কাজ শেষ। এর পরই তিনি অফিসের জন্য যাত্রা করবেন।

চাবি দিয়ে সিন্দুকটি খোলার পর একটা চিন্তা পেয়ে বসলো রাহাত সাহেবকে, আগে এমনভাবে তিনি কখনোই ব্যাপারটি ভেবে দেখেন নি। তিনি ভাবলেন, ব্রিফকেসটিকে সিন্দুকে রেখে তালা দেওয়াটা কতোটা যৌক্তিক? আদৌ কি কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে এর? ব্রিফকেসটিকে তিনি সিন্দুকে রাখছেন ভিতরে থাকা টাকাগুলির নিরাপত্তার জন্য, সোজা কথায় বলতে গেলে চোর-ডাকাতের হাত থেকে নিরাপদে রাখার জন্য। এটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আশঙ্কা নেই তার, কারণ এই বাড়িতে তিনি একা থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, চোর-ডাকাত যদি এই ঘরে ঢুকেই পড়ে, তাহলে এই সিন্দুকটি কি আসলেই কোনো নিরাপত্তা দিতে পারবে টাকাগুলিকে? সিন্দুকটির তালা ভাঙা কি খুব বেশি কঠিন হবে? চোরই হোক বা ডাকাতই হোক, তারা কি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে আসবে না?

রাহাত সাহেব সিন্দুকের তালা বন্ধ না করেই ঘর থেকে বের হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যদিও তিনি জানেন এটি কোনো স্বাভাবিক কাজ নয়, কিন্তু কিছুটা খেয়ালীপনা তাকে পেয়ে বসেছে। তবে একে শুধুমাত্র খেয়ালীপনা বললে তাঁর মোটামুটি যৌক্তিক ভাবনাটিকে অবহেলা করা হবে।

এবার শোবার ঘরের দরজা চেপে ছিটকানি দিলেন রাহাত সাহেব, হাতে নিলেন বহু দিনের ব্যবহৃত তালাটি। তালা— নিরাপত্তার প্রতীক। বহুদিন ধরে তালাটি ব্যবহার করে আসছেন রাহাত সাহেব, প্রায় তিন বছর তো হবেই।

ঝকঝকে মজবুত চাইনিজ তালা এটি, নিকেলিংও এখনো ওঠেনি তেমন। রাহাত সাহেব মনে মনে বললেন, হায়রে চাইনিজ! তোরা এতো কিছু বুঝলি, আর এই সামান্য জিনিসটা বুঝলি না? তালা বানিয়ে হবেটা কী? যতই মজবুত বানাস, আর যতই নিকেলিং করিস, কিছুই যায় আসে না। নিকেলিং কেনো? সোনা, রুপা দিয়ে প্রলেপ দিলেও বা কী হবে? যদি কেউ ভাঙতেই চায়, কোনো কিছুই কি টিকবে? কিচ্ছু টিকবে না, কিচ্ছু না। তাছাড়া যে কোম্পানি তালা বানাচ্ছে, তারাই হয়তো আবার গোপনে তালা ভাঙার যন্ত্রও বানাচ্ছে! কে জানে?

রাহাত সাহেব অনেকক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কি অর্থহীন চিন্ত াভাবনা করছেন? নাহ্, অন্তত এই মুহূর্তে এর চেয়ে যৌক্তিত ভাবনা তাঁর কাছে আর কিছুই হতে পারে না। তিনি যে সবসময় আজগুবি চিন্তা করেন, তা নয়। তবে ছোটবেলায় প্রচুর পরিমাণে করতেন। এ-ধরনের চিন্তার এক আশ্চর্য ধরনের সুখানুভূতি আছে, যা তিনি এই কর্মব্যস্ত জীবনে এসে প্রায় ভুলতে বসেছেন। আজগুবি চিন্তা বলতে যা বোঝায়, তার কিছুটা তিনি ইদানীং শুধুমাত্র রাতের বেলাতে একা একা খাটের উপরে শুয়ে করে থাকেন, তবে ওগুলি পুরোপুরি আজগুবি চিন্তা নয়। ওই চিন্তার সাথে প্রয়োজনের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। প্রয়োজন থেকে উদ্ভুত কোনো চিন্তাকে আজগুবির মর্যাদা দেওয়া যায় না। আজগুবির স্থান আরও উপরে।

প্রায় তিন মিনিট কেটে গেছে দরজার সামনে। আর ত্রিশ মিনিটের ভিতর অফিসে পৌঁছাতেই হবে রাহাত সাহেবকে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সময় এটা নয়। রাহাত সাহেব তার পূর্বের যুক্তিরই প্রলম্বন ঘটালেন— যদি কেউ ঘরের প্রধান দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই পড়ে, তাহলে এই সামান্য তালাটির প্রয়োজনীয়তা কোথায়? বরংচ এই তালাটি হয়তো চোর-ডাকাতদের হাসির খোরাক জোগাবে। ওরা হয়তো এটা দেখে ভাববে— শালা উজবুক! টাকার জন্য মায়া কতো? গাধাটা কি বোঝে না যারা কল্যাপসিবল্ গেট আর মেইন দরজার তালা ভাঙতে পারে, তাদের কাছে এই ছোট্ট তালাটা নস্যি? নাহ্, এতো অপমান সহ্য করা সম্ভব নয়। তুচ্ছ চোর-ডাকাতেরা এইভাবে অপমান করবে? চোখের সামনেই হোক বা আড়ালে, এটা সহ্য করা অসম্ভব। রাহাত সাহেব দ্রুত পায়ে দরজার সামনে থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে এলেন।

তাঁর তিনটি ঘরে ঢোকবার প্রধান দরজার সামনে এখন দাঁড়িয়ে রাহাত সাহেব। ঘর থেকে আসার সময় ঢাউস তালাটিও সাথে করে নিয়ে এসেছেন তিনি। তালাটির বিশালাকার শরীর দেখে কিছুটা হেসেই ফেললেন তিনি। এই তালাটির সাথে তাঁর শোবার ঘরে ব্যবহৃত ছোট তালাটির পার্থক্য শুধু আকারেই। যেহেতু তালা নামক বস্তুটিই রাহাত সাহেবের কাছে এই মুহূর্তে নিরর্থক, তাই এই বিশালাকার তালাটি তাঁর কাছে আরও বেশি হাস্যকর ঠেকছে। তবে তিনি কিছুটা

সন্ত্রস্তও হয়ে পড়েছেন। এই তালাটিও কি তিনি না লাগিয়ে চলে যাবেন? পাগলামোটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? রাহাত সাহেব কিছু না ভেবেই ছিটকানিতে তালাটা লাগিয়ে দিলেন। নাহ্, তালাটা বড্ড বেমানান ঠেকছে। মুহূর্তেই আবার তালাটি ছিটকানি থেকে বের করলেন রাহাত সাহেব, কিছুটা ঝুঁকে তালাটা মেঝের উপরই রেখে দিলেন। তিনি ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন— শুধুমাত্র কল্যাপসিবল্ গেট লাগিয়েই তিনি আজ অফিসে যাবেন। ওটাই যথেষ্ট নিরাপত্তার জন্য। কল্যাপসিবল্ গেটটা রাস্তার একদম পাশে, তাই সেটিতে লাগানো তালা কেউ ভাঙছে দেখলে রাস্তার মানুষ সবাই দেখতে পাবে খুব সহজেই। মানুষ যে কেনো বাড়ির ভিতরে অযথা তালা লাগায়? ধুর!

রাহাত সাহেব বাড়ির বাইরে চলে এসেছেন। উল্টোপাল্টা ভাবতে ভাবতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কল্যাপসিবল্ গেটটা টানা হয়ে গেছে রাহাত সাহেবের। তিনি তালাটি আটকাতে আটকাতে রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটা রিক্সাকে থামতে বললেন। রিক্সা চড়েই তিনি অফিসে যাবেন। রিক্সাটির পিছনে রাস্তার ওপাশে একটি ছিপছিপে গড়নের যুবক নজরে এলো রাহাত সাহেবের। ছেলেটার চলাফেরা খুবই সন্দেহজনক। রাহাত সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটার দিকে। কিছু বাদেই ছেলেটি সামনের একটা বাড়িতে ঢুকে গেলো। কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন রাহাত সাহেব। কিন্তু ততক্ষণে আরও একবার অদ্ভুত চিন্তাটা আক্রমণ করে বসল— সামান্য আগে বাড়িতে ঢুকে পড়া ছেলেটির হয়তো কোনো খারাপ মতলব নেই। কিন্তু অন্য কারো তো থাকতে পারে! আর সেটা যদি থাকেই, তবে এই কল্যাপসিবল্ গেটটা কী এমন সুরক্ষা দেবে? কতো বড়ো বড়ো ব্যাংক অব্দি লুট হয়ে যাচ্ছে! আর এই সামান্য বাড়িটাতো কোনো ছার! কী হবে এই সব দরজা-তালা-গেট দিয়ে? কী অর্থ আছে এসবের? কেউ যদি সত্যিই চক্রান্ত করে থাকে, তাকে কি সত্যিই ঠেকানো সম্ভব? হয়তো এই নিরাপত্তাগুলি কিছুটা বাধা দেবে, তবে ওই পর্যন্তই। তাছাড়া যেসব বাড়িতে চোর-ডাকাত ধরা পড়ে, সেই বাড়ির গৃহকর্তা পরবর্তীতে কখনো শান্তিতে ঘুমাতে পারে বলে মনে হয় না। সারা জীবনই হয়তো তার সংশয়ে কাটে। টাকা ভর্তি ব্রিফকেসটি বা বাড়িটি কারো লুট করার পরিকল্পনা না থাকলে, গেট না আটকালেও কেউ ভিতরে ঢুকবে না। বাড়িটি যে সম্পূর্ণ অসুরক্ষিত, সেটা কেউ বুঝবে কী করে? ভিতরে ঢোকার সাহস পাবে কোথা থেকে? তাহলে?

রাহাত সাহেব রিক্সায় উঠে বসলেন। রিক্সাওয়ালা অবাক হয়ে বললো, 'গেট আটকাবেন না, স্যার?'। রাহাত সাহেব কিছুটা উঁচু গলায় উত্তর দিলেন, "সেটা তোমার ভাববার বিষয় নয়। দ্রুত চালাও। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাতেই হবে"।

অফিসে আসার পর মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করতে থাকলেন

রাহাত সাহেব। বাড়িটি ওইভাবে ফেলে আসা যে সত্যিই একটা আহম্মকি ছাড়া আর কিছু হয়নি, এটা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে রাহাত সাহেবের প্রায় দুই ঘণ্টা লেগে গেল। তিনি কেমন করে এই ছেলেমানুষি করতে পারলেন? তিনি উন্মাদ হয়ে যাননি তো? তিনি কোনো জগতে ছিলেন এতোক্ষণ? দুশ্চিন্তায় রাহাত সাহেব ঘামতে শুরু করলেন। তড়িঘড়ি করে তিনি রিক্সা নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। বাড়িতে ফেরার সময় আশ্চর্যজনকভাবে পথের প্রতিটি মানুষকেই রাহাত সাহেবের চোর মনে হতে থাকে— রাস্তার প্রতিটি মানুষই যেন তাঁর বাড়ি লুট করতে যাচ্ছে! তবে সব কিছু যেমন ফেলে গিয়েছিলেন রাহাত সাহেব, ঠিক তেমনই আছে। গেট পেরোলেন তিনি। দরজা ঠেলে শোবার ঘরে ঢুকলেন, সিন্দুক থেকে ব্রিফকেসটা বের করে টাকাগুলি গুনে দেখলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন রাহাত সাহেব ।

বৃহৎ সমীপে ক্ষুদ্র

তোমায় কী বলে সম্বোধন করবো, ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি, আপনি, তুই বা সবই বলা যায় তোমায় বা কোনোটিই নয়; তোমার অস্পষ্ট রূপ এর কারণ। আজ তোমায় তুমি করেই বলছি; তোমায় খুব 'মা' বলতে ইচ্ছা করছে, যদিও তুমি ঠিক নারীরূপী নও, তোমার ধারণা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। আমার কিছু অভিযোগ আছে তোমার কাছে, অভিযোগের একনিষ্ঠ শ্রোতা মায়ের চেয়ে ভালো কেই বা হতে পারে?

আমার অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা, অনেক ব্যথা;— ভণিতা না করেই বলে ফেললাম। ভণিতা করা তোমার কাছে সাজে না— তুমি সর্বজ্ঞানী, আমার আগেই আমার ব্যথার কথা তুমি জানো। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি কি ঠিক আমার মতো করে জানো? তোমায় ছোট করছি না। তোমারই অন্তর্গত আমি, আর আমার অন্তর্গত ব্যথা, সেই ব্যথাই কিনা তোমার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে? ক্ষণিকের জন্য অগ্রাহ্য করে? কী স্পর্ধা! ব্যথা হয়তো এমনই, মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তোমারও তোয়াক্কা করে না; চিন্তায়, কথায়, ভঙ্গিতে ঘৃণার প্রকাশ ঘটায়। দোষী তাহলে কে? আমি না ব্যথা?

আমি জানি না ঠিক কোনো দোষে এখনো আমার উচ্চতা তিন ফুট চার ইঞ্চি, যদিও বয়স পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। সত্যি করে বলো তো, আমি এমন কেন? চেহারা আমার কুৎসিত, আমি তা মেনে নিয়েছি, কিন্তু আর একটু উচ্চতা কি আমি পেতে পারতাম না? রাস্তায় বের হলে যখন তোমার আশীর্বাদপুষ্ট উচ্চতাসম্পন্ন মানুষগুলো আমায় অচেনা কোনো জন্তু ভেবে তাকিয়ে থাকে, বাচ্চাগুলো 'বাটুল বাটুল' বলে খেপাতে থাকে, চরম বদমাস বখাটেগুলো "এই তুই এইখানে ক্যান? সার্কাসে যা" বলে মুখ বাঁকিয়ে হাসতে থাকে, নিজেকে আমার শূকর জাতীয় প্রাণী মনে হয়। না, শূকরকেও এতটা সহ্য করে না; শূকর তো শূকরই, ওর পরিচয়ের দ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু আমি কী? মানুষ, শূকর না তোমার অনাসৃষ্টি? তুমি সৃষ্টিকর্তা, সব সৃষ্টি করেছো, কিন্তু অনাসৃষ্টি কি সৃষ্টি নয়? তোমার কঠোর অনুসারীরা তা মানে না, জানি না তুমি মানো কিনা, যদি মানতে তবে অন্তত সান্ত্বনা পেতাম। এক পা খোঁড়া বিশ্রী দর্শন ক্ষুদ্র শরীর নিয়েও নিজেকে সৃষ্টির অংশ ভাবার আনন্দ কি কম? হ্যাঁ, বাম পাটা আমার খোঁড়া, প্রায় ৪ বছর আগে একটা দুর্ঘটনায়। আমি রাস্তা

পার হচ্ছিলাম সাবধানেই, পিছন থেকে হর্ন না চেপেই গাড়িটা আমায় ধাক্কা মারে, মরে গেলেই ভালো হতো, সৃষ্টির হাতে অনাসৃষ্টির বিনাশ হতো।

এভাবেই বেঁচে আছি বেশ দুটো তকমা নিয়ে— বেঁটে আর খোঁড়া। মাঝে মাঝে বেশ কৌতুক বোধ হয়। মনে হয় আমায় তুমি "আদর্শ কুৎসিত" বানাতে চাচ্ছো। আচ্ছা, আমি কি সেই ব্যাঙগুলোর একটি আর তুমি দুষ্টু ছেলে? আমার মনে হয় না তুমি তোমার সৃষ্টির গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মারতে পারো, আঘাত দিতে পারো। কিন্তু আঘাত যে আমি পাই, পেয়ে আসছি। তবে বুকে হাত রেখে বলতে পারি— আমি দোষী নই। এমন কোনো দোষ আমি করিনি যার ফলের যন্ত্রনা এতো তীব্র হতে পারে। আমার মতো দুর্বল একটা মানুষের দোষ করার মতো সাহস কোথা থেকে আসবে? আমার শরীর আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে, এমন একটা কুৎসিত শরীর নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ানোর সাহসও আমার নেই। যে পৃথিবী এতো সুন্দর, তার মাঝে আমার স্থান কোথায়? এই একটি প্রশ্ন আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়; যন্ত্রণা, ব্যাথা, দুঃখ— সব কিছুর উৎস এই অপরাধবোধ যা আমাকে হীন করে দিয়েছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পেরেছিলাম আমার অবস্থানটা ঠিক কোথায়; বুঝতে পারতাম যাদেরকে আপন মনে হতো, তারা আসলে করুণা করে আসছে। এতই যদি উদার হবে তারা, নিয়ে যাক আমায় তাদের স্বাভাবিক জীবনে। পারবে? পারবে না। দোষ দেবো না তাদের, কুৎসিতকে সহ্য করারও একটা সীমা আছে। তুমি নিজেও কি সহ্য করতে পারো আমায়? আমি যদি তুমি হতাম তবে পারতাম না। হয়তো এজন্যই তুমি মহান, মহান বলেই তুমি মৃত্যুর পর স্বর্গ রেখেছো। কিন্তু আমার স্থান যদি সেখানেও হয়, তবুও কি যন্ত্রণা লাঘব হবে? আমি যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি এখানে, তা তো যন্ত্রণাই থেকে গেলো। সুখ যদি স্বর্গে পাওয়া যায়, তো এখানে পেতে দোষ কোথায়? তোমার স্বর্গ- নরকের জীবন প্রকৃত জীবন হলে, এই পার্থিব জীবন নয় কেন? এ জীবন কি যাপিত হচ্ছে না? কোনো অংশে এর মূল্য কম? তুমি বলবে এটা পরীক্ষাক্ষেত্র, সংযম দেখাতে হবে, ফলস্বরূপ অপার সুখ। কিন্তু সমগ্র জীবন সংযমের মধ্যে থেকে বুঝেছি- এর মানে নিরঙ্কুশ দুঃখ। দুঃখই কি তাহলে পরীক্ষা?

আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, অনেক ক্লান্ত। ফ্যানের সাথে দড়ি ঝুলিয়েছি, নিচে টেবিল, টেবিলের উপর একটা চেয়ারও রাখতে হয়েছে। তবে এই শেষ মুহূর্তে এসেও স্বস্তি পাচ্ছি না। টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে চেয়ারটা মুখ ভেঙচে বলছে "তুই বেঁটে"।

প্রকাশ : *শাশ্বতিকী*

কবি ও নিষ্ঠুর রাজকন্যা

দীর্ঘক্ষণ ধরে এক যুবক নির্জন এই সুউচ্চ পাহাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে একাকী, চেয়ে আছে নিচের খাঁদের দিকে— যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটি মৃতদেহের স্তূপ। মৃতদেহগুলির মধ্যে দু-একটির শরীরের মাংস এখনও অবশিষ্ট আছে, আর বাকিগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিণত হয়েছে কঙ্কালে।

আকাশে তীব্র শব্দ করে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে আচমকা, কিন্তু যুবককে সামান্যতম বিচলিত মনে হয় না তাতে। দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর সহসা এরূপ শব্দের পরও যুবক একটি বারের জন্যও তাকায় না আকাশের পানে, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ শুধু নিচের খাঁদের দিকে। মৃতদেহগুলির দিকে তাকিয়ে যুবক শুধু মনে মনে বলে, "তোমরাও কি আমার মতো এভাবে অপেক্ষা করেছিলে?"

যুবকের প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয় একটু বাদেই। সে দেখতে পায় পাহাড়ের নিচে আঁকাবাঁকা পথ ধরে একটি সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এগিয়ে আসছে সম্পূর্ণ কালো পোশাকে মোড়া একজন মানুষ। দেহের গড়ন দেখে সে যে নারী, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঘোড়ার গাড়িটিতে চালকসহ আরও অবস্থান করছে দুজন ভয়ঙ্কর দর্শন প্রহরী।

ঘোড়ার গাড়িটি এসে দাঁড়ায় পাহাড়ের পাদদেশে। গাড়ি থেকে নেমে আসে কালো পোশাক পরিহিতা সেই নারী, আস্তে আস্তে সে পাহাড় কেটে বানানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে।

এই কি সেই নিষ্ঠুর রাজকুমারী? এই কি সেই অহংকারী নারী, যে নিজের রূপের জন্য এতই গর্বিত যে, সর্বক্ষণ নিজেকে ঢেকে রাখে কালো কাপড়ের আবরণে?—যুবক ভাবে।

যুবক অবাক চোখে তাকিয়ে রয় রাজকুমারীর দিকে। কী অপরূপ তার দেহকাঠামো! কী মোহময় তার পদচালনা! ক্ষণিকের জন্য আড়ষ্ট হয়ে যায় যুবক, শুধু ভাবতে থাকে— যাকে কালো কাপড়ে ঢাকা অবস্থাতেই দেখলে মুগ্ধ হতে হয়, সত্যিই সে না কত সুন্দর! এতদিন ধরে যুবক রাজকুমারীর এই অহংকারকে যুক্তিহীন ভেবে এসেছিলো মনে মনে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এমন অহংকার রাজকুমারীকেই মানায়।

অহংকার তো সুন্দরীর অলংকার, তার মাত্রা একটু বেশি হলেও অসহনীয় নয়। কিন্তু নিষ্ঠুরতা? তার পিছনে কী যুক্তি থাকতে পারে? তবে যুবক জানে, রাজকুমারীর এই নিষ্ঠুরতার সূত্রপাত ওই অহংকার থেকেই। যুবক যে নিজেই আজ হয়ে যেতে পারে সেই নিষ্ঠুরতার নির্মম শিকার! পরবর্তী কিছু মুহূর্তের উপরই নির্ভর করছে যুবকের জীবন-মৃত্যু। সে যে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী!

যুবকের আগে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছে অনেকেই, এবং তাদের প্রত্যেকের স্থান হয়েছে পাহাড়ের নিচে ওই খাঁদে। একে একে এসেছে তারা আর বাড়িয়ে গেছে খাঁদে পতিত মৃতদেহের সংখ্যা। গত অর্ধযুগ ধরে রাজকন্যা তার জীবনসঙ্গি খুঁজে চলেছে, কিন্তু খুঁজে পায়নি কাউকে; এবং ব্যর্থ পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করেছে খাঁদে ফেলে।

রাজকন্যা পাহাড়ের উপর উঠে প্রহরীদের দূরে দাঁড়াতে বলে, এবং যুবকের কাছাকাছি এসে বলে,

—তুমি কি আমার পাণিপ্রার্থী সেই কবি?

—রাজকন্যা, আমি কবি শুধু সেই মুহূর্তেই, যখন আমি কাব্য রচনা করি; অন্য কোনো সময় নয়। কাব্যরচনার সময়টুকুবাদে আমি সবার মতো সাধারণ মানুষ।

—যাই হোক, তুমি সব জেনেশুনে এখানে এসেছো তো?

—হ্যাঁ, আমি সব জেনে বুঝেই এসেছি এখানে। আপনাকে মুগ্ধ করতে পারলে আপনি আমায় জীবনসঙ্গি করবেন, আর ব্যর্থ হলে নিক্ষেপ করবেন ওই খাঁদে।

—হ্যাঁ, এটাই আমার প্রথম ও প্রধান শর্ত। গত ছয় বছর ধরে আমি তাই করে চলেছি। এই রাজ্যে এই নির্বাচন পদ্ধতি আইন বহির্ভূত নয়। আর কথা বাড়িও না। পারলে তোমার কাব্য দিয়ে আমায় মুগ্ধ করো...

—রাজকুমারী, আপনি আজ্ঞা দিলে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতাম।

—আমি এখানে অযথা সময় নষ্ট করতে আসিনি। রাজমহলের বাইরে আমি বেশিক্ষণ শাকতে পছন্দ করি না। অতি দ্রুত তোমার প্রশ্ন শেষ করো।

—আপনাকে ধন্যবাদ, রাজকুমারী। আমার প্রশ্ন হল— আপনি নিজেকে সর্বদাই এই কালো পোশাকের আড়ালে কেন ঢেকে রাখেন ? আপনি অপরূপ সুন্দরী, তা আমি জানি। আবার এও জানি, যা সুন্দর তা স্বপ্রকাশিত। সৌন্দর্য তো আড়ালে থাকার জন্য নয়। গোলাপ যদি গর্বিত হয়ে কুঁড়ি অবস্থাতেই থেকে যেত, তাহলে আমরা কি বঞ্চিত হতাম না? সৌন্দর্য যদি চাপা পড়ে থাকে, সে তো দুনিয়া ও নিজের– উভয়ের প্রতিই অবহেলা।

—তোমার এই যুক্তি সব কিছুর জন্য প্রযোজ্য হলেও, আমার ক্ষেত্রে নয়। আমার সৌন্দর্য সবার জন্য নয়। আমি আমাকে চিনি, যে কারো চেয়ে ভালো করে চিনি। আমি সাধারণের জন্য এই জগতে আসিনি। আমি সাধারণ নই, এবং সাধারণ নই আমার সৌন্দর্যের কারণে। আমার কাছে অধিকারের প্রশ্ন সবার আগে। সাধারণ মানুষ আমায় দেখার অধিকার রাখে না, তারা দেখলে আমি আমার অসাধারণত্ব হারাবো। আমায় দেখার জন্য আমার মতো অসাধারণ হতে হবে– কোনো না কোনো ভাবে।

—রাজকুমারী, অধিকারের ক্ষুদ্র আওতায় সুন্দরকে ফেলা কি যৌক্তিক? জগতের সকল সুন্দরের উৎস এই যে আমাদের জীবন, তা কি আমরা কোনো অধিকার বলে পেয়েছি? যে আমরা পৃথিবীর বুকে কখনোই ছিলাম না, তাদের কি অধিকার থাকতে পারে এ-অমূল্য জীবনযাপনের? সুন্দরের আলোয় সবাই আলোকিত হয়, তাতে তার নিজের কোনো হানি ঘটে না। বনের মাঝে যে ময়ূরের অবাধ বিচরণ, কেউ দেখে ফেলার পর কি তার পেখমের রঙ কখনো ধূসর হয়ে গেছে? সাধারণ মানুষের যদি সুন্দরকে দেখার অধিকার না থাকে, তাহলে তাদের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই। আমার কথায় দোষ নেবেন না। আপনি সুন্দরী, অহংকার আপনার সাজে। তবে পৃথিবীর সব সুন্দরই যদি নিজেকে এভাবে লুকিয়ে রাখতো, তাহলে মানুষের বেঁচে থাকাই দায় হত। যে বৃদ্ধ আগামীকাল পৃথিবী ছাড়বে, সেও চায় মৃত্যুর আগে সুন্দর কোনো কিছুর দ্বারা ক্ষণিকের জন্য পুলকিত হতে...আপনি নিজেকে সব কিছুর চেয়ে আলাদা ভাবছেন। কিন্তু একটিবার ভাবুন, আপনি নিজেকে আলাদা ভাবছেন শুধুমাত্র সৌন্দর্যের মাত্রার কারণে, অন্য কোনো কারণে নয়। বিশ্বের সব সুন্দর প্রকাশিত হতে পারলে, আপনিও...

—কবি, তুমি কিন্তু এখনো আমায় দেখোনি। দেখলেই বুঝতে পারবে তোমার যুক্তির অসারতা। আমার সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে তুমি বুঝবে আমি কেন নিজেকে আড়াল রাখি।

—আমি আপনাকে এখনো দেখিনি, সে কথা ঠিক। কিন্তু সব ঝিনুকে মুক্তা না থাকলেও, কিছু কিছু ঝিনুককে দূর থেকে দেখলেও মন কেন জানি বলে দেয় তাতে মুক্তা আছে। আমি জানি, এই বিশ্বে আজকের প্রবল বিশ্বাস কাল মুখ থুবড়ে পড়ে। কিন্তু তারপরও বাঁচতে গেলে কিছু জিনিসকে সত্য ধরে বাঁচা ছাড়া কোনো উপায় নেই, রাজকুমারী। কবিকে যেমন বিশ্বাস করতে হয় সত্য সুন্দর, তেমনি সুন্দরের অবাধ প্রকাশকেও সত্য ধরে নিতে হয় তাকে।

—তোমার এই যুক্তিতর্ক দেখে আমি অবাক হচ্ছি। অনেকেই এসেছে আমার পাণিপ্রার্থী হয়ে, কিন্তু কেউ এভাবে তর্ক করেনি। সবাই এসেছে আর তারা যে বিষয়ে পারদর্শী, তা প্রদর্শন করে আমায় মুগ্ধ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউ

পারেনি, কেউ না; এবং পূর্বশর্ত অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে ওই নিচের খাঁদে ফেলে হত্যা করা হয়েছে। দূরে দাঁড়ানো ওই দু'জন প্রহরীকে ডাকলেই ওরা টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে তোমাকেও...

—রাজকুমারী, তাদের কি কোনো দোষ ছিলো? আমি পূর্বেই শুনেছি আপনার প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু সঠিক কারণ কেউ বলতে পারেনি। আমি নিজেও ভেবে পাইনি। কেন এ-নিষ্ঠুর বিধান?

—হা হা...তুমি এটাও জানো না? তারা কেউই বিনা কারণে মৃত্যুবরণ করেনি। মৃত্যুর আগে তারা এমন কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করে, যার যোগ্য তারা নয়। তাই তাদের জন্য মৃত্যুই শ্রেয়। এই পাহাড়ের উপরে আলাপচারিতার এক পর্যায়ে আমি প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীকে আমার এই কালো পোশাক উন্মোচিত করে নিজেকে দেখাই। কিন্তু যেহেতু তারা আমার মন জয় করতে পরবর্তীতে ব্যর্থ হয়, আমি তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দিই। পৃথিবীর বুকে আমার রূপ দর্শন করেছে অথচ আমার যোগ্য নয়, এমন কারো অস্তিত্ব আমি রাখবো না। তাদের মৃত্যু না হলে ফিরে গিয়ে তারা জনে জনে আমার রূপের গল্প করবে, হয়তো অন্য কোনো নারীর সাথে আমার তুলনাও করবে– আমি সহ্য করবো না এসব। যাই হোক, তুমি কি ভয় পাচ্ছো, কবি? যথেষ্ট সাহসী না হয়ে আমার সামনে আসা ঠিক নয়।

—রাজকুমারী, কবিরা আজন্ম কৌতূহলী। কবির যদি কৌতূহল না-ই থাকে, তাহলে সে কাব্য লিখবে কী করে? আর যারা সেই কাব্য পড়বে, তারাই বা পড়বে কোনো কৌতূহলে? আমি এসেছি আমার কৌতূহলের কারণে। জনে জনে আপনার কথা শুনে আমি নিজেকে আটকে রাখতে পারিনি। আমায় যদি বলা হয়, সুবিশাল কোনো মরুভূমি পার হলে আমি অজানা-অদেখা কোনো কিছুর দেখা পাবো, আমি সেখানেও নির্দ্বিধায় ছুটে যাবো, যেমন এসেছি আপনার কাছে। আমরা তো মৃত্যুর পরোয়া করতে শিখিনি, রাজকুমারী। আমার কাছে আপনি এক তীব্র কৌতূহল। আমার জীবনের দামেও যদি যে কৌতূহল নিবারিত হয়, তাহলেও আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না।

—তোমরা কবিরা অদ্ভুত সব কথা বলো। যদিও তোমার সব কথা আমি কখনোই মানবো না, তারপরও ক্ষণিকের জন্য নিজেরও মনে হতে থাকে যেন আমি মেনে নিয়েছি। পাণিপ্রার্থী হয়ে আমার কাছে বিখ্যাত সব সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী, যোদ্ধা, সুদর্শন যুবকেরা এসেছে; কিন্তু তারা কেউ কখনো আমায় আমার কৃতকর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলে বা করে আমায় মানাতে পারেনি। তুমি ক্ষণিকের জন্য হলেও পারছো।

—আপনি আজ্ঞা না দিলে আমার কিছুই বলা হতো না, রাজকুমারী। কিছু কথা বলতে দেবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার আরেকটি প্রশ্ন

ছিলো, হত্যা করার আগে আপনি নিজেকে কেন একবারের জন্য উন্মোচিত করেন আপনার পাণিপ্রার্থীদের সামনে? কেনো তাদের বুকে আকাঙ্ক্ষার দীপ জ্বালান, যে দীপ ক্ষণিক বাদেই আপনি নিজেই নিভিয়ে ফেলেন নির্মম ফুৎকারে?

—যারা আমার কাছে আসে, আর তাদের নিজ নিজ শৈলী দ্বারা আমায় কিছুটা হলেও মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়, আমি তাদের পৌরুষত্ব মেপে দেখি নিজেকে উন্মোচন করে। আমি জানি, আমায় দেখলে পৃথিবীর যে কোনো মানুষ মুগ্ধ হবে। তবে কেউ যদি আমায় দেখে মুগ্ধ হয়ে হতজ্ঞান হয়ে পড়ে, তাহলে তার পৌরুষত্ব কোথায়? আমি পুরুষের চোখে কামনা দেখতে ভালোবাসি, তবে সে কামনা হবে সংযমের কঠোর বাঁধনে আবদ্ধ। যারা আমার সামনে এসেছে এবং আমার রূপ দেখেছে, তাদেরকে খুব অসহায় মনে হয়েছে আমার। অনেককে আমি নির্বাকও হয়ে যেতে দেখেছি। যে আমায় দেখলে অসহায় বোধ করে, সে আমার জীবনসঙ্গি হবে কী করে?...আমি তোমার সামনেও এখন এই কালো পোশাক ত্যাগ করবো...

—কিন্তু আমি তো আমার শৈলী এখনও প্রকাশ করিনি, রাজকুমারী। আমি তো আপনাকে আমার রচিত কোনো কাব্যও শোনাইনি।

—তোমার কথাই তো কাব্যের মতো, কবি।

রাজকুমারী আরও কিছুটা এগিয়ে আসে যুবক কবির কাছে। কবি আরও একবার খাঁদের মৃতদেহগুলির দিকে চেয়ে দৃষ্টি ফেরায় রাজকুমারীর দিকে। রাজকুমারী ধীরে ধীরে তার মাথা থেকে পা অব্দি পরিহিত কালো বসন খুলে ফেলে, অনাবৃত হয় অতি চাকচিক্যময় ও রাজকীয় পোশাক পরিহিতা অভূতপূর্ব এক নারীমূর্তি।

—অপূর্ব রাজকুমারী! আপনি অপূর্ব! আজ আপনাকে দেখে দীর্ঘ-প্রচলিত একটি উপমা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলো। মানুষ সুন্দরী রমণীদের দেখে বলে, "তুমি কবির কল্পনার মতো সুন্দর"; কিন্তু আপনাকে দেখে আজ সে-ধারণার যৌক্তিকতা নিয়ে আমি সন্দিহান হয়ে পড়েছি। আমি শত শত নারীমূর্তির ছবি এঁকেছি মনে মনে, তাদের উদ্দেশ্য করে কাব্য রচনা করেছি বহু; কিন্তু আমার স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই, আপনি আমার কল্পিত যে কোনো নারীমূর্তির চেয়ে বেশি মনোহর...এই বিশ্ব হাজার হাজার ব্যর্থ কবিতে পরিপূর্ণ। আমার তাদের জন্য দুঃখ হচ্ছে। তারা যদি একটি বার, মাত্র একটি বার আপনার দর্শন পেতো, তাহলে তাদের কবি জীবন সার্থক হতো। তাদের কাব্য-ভূমি অনাবাদি জমির মতো পড়ে রয় শুধু রূপ-বৃষ্টির অভাবে। আপনার এ-রূপ বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে প্লাবন আনতো তাদের কাব্যে। কিন্তু হায়! তাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি...

—কাব্য সৃষ্টির চেয়ে আমার কাছে আমার মর্যাদার মূল্য অনেক বেশি। আমার প্রশংসা সবাই করুক আমি তা কখনোই চাইনি, কখনো চাইবোও না।

আমি প্রশংসা, গুণগান শুনতে চাইবো শুধুমাত্র আমার যোগ্য জীবনসঙ্গির কাছে, আর কারো কাছে নয়। আমাকে পেতে চাইলেও যেমন যোগ্য হতে হবে, প্রশংসা করতে চাইলেও যোগ্য হতে হবে।

—রাজকুমারী, আপনি ভুলে যাচ্ছেন মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে। আপনার জীবনসঙ্গি হবে মাত্র একজন। আর একার পক্ষে এ যে সম্ভব নয়! সূর্যালোকের বন্দনা কি কেউ একা করতে পেরেছে? নদীর কুলকুল ধ্বনি শুনে এই বিশ্বে কি শুধু একটি গানই রচিত হয়েছে? নাকি হয়েছে হাজারো হাজারো? রাজকুমারী, আপনার জীবনসঙ্গি যে হবে, তার অবস্থা হবে প্রচুর হীরকখণ্ডে ভরপুর কোনো প্রচণ্ড ভারী বোঝার বহনকারীর মতো।

—কবি, আমি রাজকন্যা, রাজবংশীয় রক্ত আমার শরীরে বয়ে চলেছে। পরাজয় আমি সহ্য করতে পারি না; কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তোমার কথার কাছে আমি হেরে যাচ্ছি বারবার। স্বীকার করতেই হবে, এই হেরে যাওয়া আমায় ক্ষুব্ধ করছে না। এই পরাজয় নিরস যুক্তিতর্কের কাছে পরাজয় নয়। তোমার কথার আবেদনের কাছে সহজ সমর্পণ করতে চাইবে যে কেউ।

—রাজকুমারী, জয় পরাজয়ের কথা আমি ভাবি না। আমি আমার সত্যের কাছে সমর্পিত; আর হয়তো ওই সত্যই আমার ভিতর থেকে তার চিরশাশ্বত আবেদন সৃষ্টি করে অন্যকে সমর্পণের পথ দেখায়।

—তোমার কথায় মুগ্ধ না হয়ে সত্যিই পারা যায় না, কবি।

—মুগ্ধতায় মুগ্ধতায় আজ এ-প্রান্তর উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠছে। আমাতে মুগ্ধ আপনি, আপনাতে আমি। আকাশের দিতে তাকান, রাজকন্যা। দেখুন, সে কেমন আপনার কালো বস্ত্রের মতো মেঘ সরিয়ে এই পৃথিবীকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে নিজেকে। দেখুন, দেখুন... আকাশ আর মাটি কেমন আমার-আপনার মতোই আলাপচারিতায় মেতে উঠেছে।

—কিন্তু কবি, তোমার মুখমণ্ডলে তো মুগ্ধতার কোনো ছাপ দেখছি না আমি। পূর্বের পাণিপ্রার্থীরা কেউ কেউ বিবশ হয়ে গেছে, আবার কেউ বা উন্মাদের মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমায় দেখে। তোমার ভেতর কোনো অস্বাভাবিকতাই দেখছি না আমি। আমি মানি, সংযম পৌরুষত্বের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তাই বলে কি মুগ্ধতার কিছুটা দৃশ্যমান লক্ষণ থাকবে না?

—রাজকন্যা, আমি সৌন্দর্যের পূজারী। আমার এ-পূজা সুন্দরকে ক্রমান্বয়ে আপন করে নেবার পূজা। সুন্দর তো আমার কাছে অচেনা কিছু নয়, যে তাকে দেখে আমি বিমূঢ় হয়ে যাবো! কাব্যের সাধনা দিয়ে আমি সুন্দরকে আপন করে নিয়েছি। সুন্দর আমার কাছে চিরচেনা, পার্থক্য হবে শুধু তার মাত্রায়। আমি আপনায় দেখে মুগ্ধ হয়েছি, চকিত হইনি।

—তোমার কথা আরও শুনে যেতে মন চাইছে। কিন্তু ওদিকে যে সন্ধ্যা নেমে এলো, আমার দ্রুতই রাজমহলে ফিরে যেতে হবে। কবি, তুমি আগামীকাল রাজমহলে এসো। তোমাকে আমার অনেক বলার আছে, কিন্তু এখন কিছু বলবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি, তোমায় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

—সে কি, রাজকন্যা? আজ তো তবে ইতিহাস রচিত হলো। পূর্বে কেউই তো এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারেনি। আমিই কি তবে প্রথম...? আপনি আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত তো, রাজকন্যা? আপনি এখন আমায় মুক্ত করে দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ, কবি। তুমিই প্রথম যে এখান থেকে জীবিত ফিরে যাচ্ছো। তবে কাল অবশ্যই রাজদরবারে এসো।

—রাজকন্যা, তবে আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি আপনার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হয়েছি? হা হা...আমার তো কোনো কাব্যই বলা হল না এখনো।

—নির্বাচনের দায়িত্ব তো আমার, কবি। আমার রায়ই তো এখানে শেষ কথা।

—তবে আমারও একটি শেষ কথা আছে। আপনার রাজমহলে আমার কখনোই যাওয়া হবে না! এভাবে জীবনসঙ্গি পাওয়া যায় না, রাজকুমারী। নির্বাচনের মতো কৃত্রিম প্রক্রিয়া দিয়ে জীবনের কিছু প্রয়োজন মেটে মাত্র, আর কিছু নয়। আপনি হয়তো আমার প্রতি কিছুটা মোহিত হয়েছেন, কিছুটা মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু মুগ্ধতার সৈকত থেকে প্রেমের তীরে যাত্রার পথে আমরা অনেকেই হয়ে পড়ি ক্লান্ত, এ আরও বড়ো কঠিন পরীক্ষা! সময় ও ধৈর্যের শিখায় দহনের পর মোহের যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাই হলো প্রেম, রাজকুমারী। তাই-ই প্রেম। তাছাড়া, আমি খাঁদে পতিত ওই মৃতদের কী জবাব দেবো? হয়তো তাদের মধ্যে কেউ সত্যিই আপনাকে ভালোবাসতে চেয়েছিলো। হায়! প্রত্যেকে তারা প্রতিযোগী। আপনাকে পাবার কোনো শর্ত থাকলে হয়তো তারা আমরণ শত্রু হয়ে নিজেদের ভিতর লড়ে যেতো। কিন্তু হায়! কী নিরুপায়-অসহায় হয়ে আজ তারা একে অপরের উপর শরীর রেখে শুয়ে আছে চিরকালের জন্য। মানুষ হিসেবে প্রতীকি প্রতিবাদ করে এখন আমার কর্তব্য ছিলো আপনারই সামনে স্বেচ্ছায় এই খাঁদে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করা, কিন্তু আমি তা পারছি না। আজ যে অমূল্য অভিজ্ঞতা লাভ করলাম আমি, তা আমার কাব্যের উৎকর্ষতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কবি ও মানুষ হিসেবে আমার সামনে আজ যে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব, তার মাঝে আমি কবির ভূমিকাকে বেছে নিয়ে মনুষ্যত্বের কাছে সলজ্জ হয়ে মাথা নোয়াচ্ছি। রাজকন্যা, আমাকে এখন যেতে হবে...

—কিন্তু তুমি এভাবে...

—রাজকন্যা, আমি জানি একজন নারী হিসেবে আপনি চিরকালীন নারীসত্তার অবিনশ্বর বৈশিষ্ট্য হেতু আকুলতা দেখাবেন; কিন্তু আমি এও জানি, আপনার সে আকুলতা আভিজাত্যের নাগপাশে আবদ্ধ। আমায় ব্যাকুল ভাবে ফেরার অনুরোধ করার যে ইচ্ছা, তার অনুভূতি আপনার কাছে এতই নতুন যে, তাকে প্রকাশ করার ভাষাও আপনার কাছে নেই। আপনি হয়তো একদিন ঠিকই জীবনসঙ্গি খুঁজে পাবেন, কিন্তু খাঁদের ওই মৃত দেহগুলির অশ্রুত হাহাকার আর আমার অকস্মাৎ প্রস্থান সম্মিলিত হয়ে বৈধব্যের রূপ ধারণ করে আপনার মাঝে রয়ে যাবে চিরকাল। বিদায়, রাজকন্যা...

কবি পাহাড় থেকে দ্রুত পায়ে নিচে নামে আসে। তাকে অনুসরণ করে রাজকন্যাও ধীর পায়ে আনমনে এগিয়ে আসে কিছুদূর। প্রহরীরা রাজকন্যাকে কালো পোশাকে আবৃত না দেখে বিস্মিত হয়, এবং মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে নিস্পলক ভাবে। রাজকন্যা তাকিয়ে রয় শুধু কবির পথের দিকে; কিন্তু কবি ফিরে তাকায় না একটি বারের জন্যও। রাজকন্যা তবুও তাকিয়ে রয় দিগন্তে পড়ন্ত সন্ধ্যার ধূসর আঁধারে কবি বিলীন না হওয়া পর্যন্ত।

নৈঃশব্দ্য

"এই যে শুনুন, আমাকে কিছু আনন্দ ধার দিয়ে যান। আমি একটি কবিতা লিখতে চাই।"— রাস্তা দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলা একজন মাঝবয়স্ক মানুষকে থামিয়ে কিছুটা আলাপ জমিয়ে জিজ্ঞাস করলেন তরুণ কবি। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে এই ব্যস্ত রাস্তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকছেন, আর পর্যবেক্ষণ করছেন হেঁটে চলা মানুষগুলিকে। রাস্তায় চলা মানুষগুলির মধ্যে কেউ কেউ বিশেষভাবে আকর্ষণ করছে কবিকে, তাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুখভঙ্গি ও হাঁটার ধরনের জন্য। তরুণ কবি তাদের মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে মনে করছেন সুখী, আবার কাউকে দুঃখী। তিনি চান তাদের সুখ বা দুঃখের কথা নিয়ে কবিতা লিখতে, আর কিছু নয়। তিনি ইদানীং উপলব্ধি করছেন, নিজের অনুভূতি বলতে তাঁর কাছে আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই; যা ছিলো, সব কবিতায় ঢেলে দেওয়া হয়ে গেছে অনেক আগেই। এই কারণেই এই নতুন সুখ-দুঃখের সন্ধান।

কবি ঠিক করেছেন দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর তিনি কিছু কবিতা লিখবেন এবার, যেগুলি বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রতিনিধি হবে। তাই দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই রাস্তাটির পাশে দাঁড়িয়ে নিজে থেকে যেচে অতি বিনয়ের সাথে মানুষের সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করছেন, আর সেই ফাঁকে পরখ করে নিতে চাইছেন প্রতিটি মানুষের অন্ত লোক। তিনি কিছুটা পরিচয়ের পরপরই সবাইকে অনুরোধ করে বলেন, "আমাকে আপনার কিছু আনন্দ বা দুঃখের ধার দিয়ে যান। আমি একটি কবিতা লিখতে চাই।" কিন্তু তেমন কেউ তাঁর কথার উত্তর দেয় না, অনেকে আবার প্রচণ্ড বিরক্তিবোধ করেন। শুধুমাত্র রাস্তার এই অপরিচিত লোকগুলিই নয়, তরুণ কবির পরিচিত মানুষেরাও কেউ এই অনুরোধ রাখেনি। তবে একটু আগে কবি পরিচিত হলেন একজন ঠ্যালাগাড়িওয়ালার সাথে, সে যেন প্রতিটি মানুষের বক্তব্যের সারসত্তা নিজের ভাঙা কণ্ঠে এনে বললো, "আরে ধুর ভাই! অতো সুক-দুক্ক ভাবনের সময় নাই। বাঁচার দরকার বাঁচি, এই গাড়িডা ঠ্যালনের দরকার ঠেলি"।

কবি বুঝতে পারলেন এমন একটি বক্তব্যের আশাই তিনি করছিলেন এতোদিন ধরে। প্রচণ্ড বেগে চলতে থাকা অসংখ্য গাড়িঘোড়াপূর্ণ ও কোলাহলময় রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আর ঠ্যালাগাড়িওয়ালার কথা মনে করতে করতে তরুণ কবি মনে মনেই রচনা করে ফেললেন এই সময়ের প্রতিনিধিরূপী দু'টি কবিতা। প্রথম কবিতাটির নাম "গতি", আর কবিতাটি একটি শব্দের—"স্থিতি"; দ্বিতীয় কাবতাটির নাম "শব্দ", এটিও একটি শব্দের— "নৈঃশব্দ্য"।

প্রকাশ : *উচ্চারণ*